গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ৫ ডিসেম্বর ২০০৩ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

সিটু'র রাজ্য সম্মেলন

পুঁজির বাধ্য বিনয়ী সেবাদাস

সিটুর অষ্টম রাজ্য সম্মেলন ২০ থেকে ২৩ নভেম্বর কলকাতায় মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। চার দিনের সম্মেলনের রিপোর্ট ও নেতৃবৃন্দের বক্তব্য যদি কেউ গণশক্তিতে মন দিয়ে পড়েন, তাহলে তাঁর বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, সিটু নেতৃত্বের অবস্থা দাঁড়িয়েছে শ্যাম রাখি না কূল রাখি। ক্লোজার, ছাঁটাই, বেতনহ্রাস, পি এফ লুঠের মতো হাজারো একতরফা মালিকী আক্রমণের সামনে পড়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া শ্রমিকরা ফুঁসছে। চটকল, চা-বাগান সহ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বহু শিল্পে সিটু নেতারা মালিকের দালাল বলে চিহ্নিত হয়ে শ্রমিকদের মারমুখী আক্রমণের সামনে পড়ছে। রাজ্যে বন্ধ বড় কারখানার সংখ্যা ২৭৪, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প মিলে ৫৬ হাজার কলকারখানা বন্ধ; লক্ষাধিক শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন।

শ্রমিকদের অবস্থা কতটা শোচনীয় তার বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন পড়েনা, শ্রমিক-কর্মচারীরাই সেটা ভাল জানেন। মূল কথাটা হল, এই একতরফা মালিকী আক্রমণের সামনে শ্রমিকরা কী করবে? প্রতিবাদ করবে? প্রতিরোধ করার জন্য সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলবে? নাকি আত্মসমর্পণ করবে? ক্রীতদাসের মত মালিকের বেআইনী অত্যাচার নিপীড়নকেও মুখ বুঁজে মেনে নেবে? রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে সিটু যা ভূমিকা নিয়ে চলেছে, শ্রমিকদের যা সে করতে বলছে, তাহল, মালিকী অত্যাচার যতই বাড়ুক, শ্রমিক কোনও আন্দোলন করতে পারবে না। যা-কিছু বিরোধ তা সি পি এম ফ্রন্ট সরকার সালিশি বৈঠক করে মীমাংসা করে দেবে। শ্রমিককে এটা মানতে হবে। কারণ, বামফ্রন্ট সরকার, সি পি এমের মতে, শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থরক্ষাকারী সরকার। কিন্তু ক্রমেই শ্রমিকরা অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝতে পারছে এই সরকারটি মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ঠুঁটো জগন্নাথ। মন্ত্রী ও নেতারা মালিকদের সভায় গিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলন না করার জন্য হুমকি দেন, কিন্তু মালিকদের যথেচ্ছ বেআইনী কাজের বিরুদ্ধে টুঁশব্দটি করেন না। ফলে, সিটু সম্পর্কে প্রথমে সন্দেহ, ও পরে এই ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে যাচ্ছে যে, সিটু মালিকদের দালালি করছে, শ্রমিকদের কথা ভাবছে না। এই বিশ্বাসঘাতকতার ও আপসের ভাবমূর্তিকে কীভাবে আড়াল করে, শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করতে একটা লড়াকু চেহারা শ্রমিকদের সামনে তুলে ধরা যায় — সেটা ছিল সিটু নেতৃত্বের সামনে একটা সমস্যা এবং অবশ্যই গভীর ও গুরুতর সমস্যা! কারণ, আজকের আক্রমণের চরিত্র ও ব্যাপকতা যেরকম তাতে শুধু বুলি দিয়ে কাজ হবে না। বাস্তবে লড়তে হবে। আর সেখানেই সিটু নেতৃত্বের হাত-পা বাঁধা। এবং নিতান্ত বাধ্য বিনয়ী সেবাদাসের মতো বাঁধনের সেই শিকল সিটু নেতৃত্ব মালিকশ্রেণীর কাছ থেকে হাত পেতে তুলে নিয়েছেন। শর্ত একটাই, তা হচ্ছে, রাজ্যের সি পি এম সরকারটিকে ক্ষমতায় থাকতে দিতে হবে। এরই নাম তাঁরা দিয়েছেন 'বাস্তববাদিতা'। '৬৭ ও '৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকার যেখানে একবার নয় মাস, একবার ১৩ মাসের বেশি টিকতে পারেনি সেখানে সি পি এম ফ্রন্ট সরকার ২৬ বছর ধরে একটানা সরকার চালাচ্ছে। মালিকশ্রেণীর পূর্ণ আশীর্বাদ, সমর্থন ও মদত ছাড়া এ জিনিস ভাবাই যায় না। ২৬ বছরে মন্ত্রীত্ব, গাড়ি, বাড়ি, বিলাস তো কম হয়নি! রাজ্য ছাড়িয়ে কেন্দ্রের দিকে তো চোখ আছে। কংগ্রেসের বা অন্য কোন দলের লেজুড় হয়েও যদি কেন্দ্রের ক্ষমতার স্বাদ পেতে হয় তাতেও মালিকশ্রেণীর সমর্থন ও মদত চাই। অতএব সরকারি গদি রক্ষা করাই সি পি এমের বৃহত্তম ও একমাত্র স্বার্থ। এ জন্যই শ্রমিকদের সামনে

চারের পাতায় দেখুন

২০ নভেম্বর লন্ডনে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ। লক্ষাধিক মানুষ এই বিক্ষোভে অংশ নেন।

বিদ্যুতের উপর নতুন সেস প্রত্যাহার কর

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৯ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

'এমনিতেই অধিকাংশ রাজ্যে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম যেখানে ২৫ পয়সা সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম ১ টাকা ৩৮ পয়সা এবং এই দাম বারবার বাড়ানো হচ্ছে। এই অবস্থায় রাজ্য সরকার কর্তৃক বিদ্যুতের উপর সেস্ বসানোর সিদ্ধান্ত গ্রাহকদের উপর আরেকটি আঘাত হবে। আমরা এই জনবিরোধী সিদ্ধান্ত বাতিল করা এবং পুলিশ ও প্রশাসনিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ কমিয়ে অন্যান্য আর্থিক অপচয় বন্ধ করে সুন্দরবনে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করার দাবি করছি।"

মদের নেশার সামাজিক ক্ষতি নিয়ে আর ভাবেনা সিপিএম

পশ্চিমবাংলার সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার তিন হাজার নতুন মদের দোকানের লাইসেন্স দিচ্ছে। গরিব ও সাধারণ মানুষ সস্তার দেশি মদ বেশি পছন্দ করে, তাই দেশি মদ বেশি বেশি বিক্রি করার জন্য, মদের দোকান-গুলোতে যা মদ বিক্রি হয় তার দ্বিগুণ পরিমাণ সরবরাহ করে বিক্রি করার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে সরকার। অতীতে যেখানে মদ বিক্রি থেকে সরকারের বাৎসরিক ১৫০ থেকে ২০০ কোটি টাকা কর আদায় হত, সেখানে এখন বাৎসরিক ৫০০ কোটি টাকার কর মদ বিক্রি থেকে সরকার আদায় করছে।

এই কর আদায় বৃদ্ধি প্রমাণ করে মদখাওয়া লোকের সংখ্যা বহু গুণ বেড়েছে। কিন্তু এতেও সরকার খুশি নয়। সহজ রাস্তায় অতি সহজে টাকা তোলার এমন সোজা পথ সরকারের হাতে আর নেই। সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার সমীক্ষা করে বলছে, মদ খাওয়া মানুষের সংখ্যা আগের থেকে অনেক বেড়েছে। এখন তাই মদকে সামাজিক নেশা হিসাবে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে বাজারে এক অভিনব মদ আমদানি করা হয়েছে, নাম দেওয়া হয়েছে 'রেডি টু ড্রিংক'। এই মদের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে সরকার বলছে, এই মদ খাওয়ার জন্য জল বা সোডা ওয়াটার মেশানোর দরকার নেই। ছিপি খুলেই খাওয়া যাবে। এই মদে ৫ থেকে ৮ শতাংশ অ্যালকোহল আছে। খেলে হালকা নেশা হবে। এই মদ বিক্রি করার জন্য ব্যাপক লাইসেন্স দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আবগারি মন্ত্রী। ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সগুলোকে এই লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। এক আবগারি অফিসার বলেন, হালকা পানীয় কোকাকোলা, পেপসির মত যাতে ঘরে ঘরে মানুষ এই মদ খায় সেই পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। আপাতত সরকারের টার্গেট মদ বেচে এক হাজার কোটি টাকা কর আদায় করা।

'রেডি টু ড্রিংক' নামক মদ চালু করলে বিভিন্ন কলকারখানা, অফিস প্রভৃতির ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সে, গৃহস্থের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাল-ডাল-মশলা কেনার দোকানেও মদ পাওয়া যাবে। যেহেতু খেলে হালকা নেশার আমেজ সৃষ্টি হবে, ফলে কমবয়সী ছাত্র-যুবকরা কৌতুহল থেকে এ মদ খেতে শুরু করবে। আর নেশায় একবার অভ্যস্ত হলে 'রেডি টু ড্রিংক' ছেড়ে আরও গাঢ় নেশার দিকে ছাত্র-যুবকরা হাত বাড়াবে। একেও সরকারি নীতির সাফল্য বলেই বুঝে নিতে হবে। কারণ, নেশার ঝোঁক বাড়লে যত দেশি মদের ক্রেতার সংখ্যা বাড়বে, ততই সরকারি আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত সরকারগুলো এসব জিনিস বহুকাল

দুয়ের পাতায় দেখুন

মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া ও সর্বত্র প্রকাশ্যে মদ বিক্রির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ডি ওয়াই ও'র ডাকে

৩রা ডিসেম্বর

সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস

এম এস এস-এর মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন

২২ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ৪র্থ জেলা সম্মেলন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয়। ২২ নভেম্বর বিকাল ৩টায় রাজ ময়দানে দু'হাজারের বেশি মহিলা দুই জেলার দূর-দূরান্তর থেকে এসে সমাবেশে যোগ দেন। প্রকাশ্য সমাবেশ পরিচালনা করেন জেলা সংগঠনের সভানেত্রী কমরেড লেখা রায়। সমাবেশের প্রধানবক্তা সংগঠনের সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা করেন। প্রতিভা মুখার্জী তাঁর বক্তব্যে স্বাধীনতার ৫৬ বছর পরেও ভারতবর্ষের নারী সমাজের শোচনীয় অবস্থার নানা দিক তুলে ধরে দেখান, পশ্চিমবাংলায় ২৬ বছরের সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের রাজত্বেও নারী সমাজের উপর শোষণ অত্যাচার দিন দিন বাড়ছে। এ রাজ্যের পুলিশ, সি পি এম দলের মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীরা এমনকি সি পি এম দলের বেশ কিছু কর্মী নারী নির্যাতন, ধর্ষণ সহ নানা অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে। মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন মা-বোনেদের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা সহ অর্থনৈতিক শোষণপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এ যুগের মহান মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রদর্শিত পথে এই সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি আহবান জানান।

এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু বলেন, এ জেলায় মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে জোরালো আন্দোলনের চাপে অপরাধী পুলিশ ও অত্যাচারীদের শাস্তি দিতে বাধ্য করেছে। সংগঠনের বিদায়ী জেলা সম্পাদিকা কমরেড কল্পনা দাসও বক্তব্য রাখেন।

সন্ধ্যায় প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৩৭০ জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণে। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে কমরেড সুনীতা গুপ্তকে সভানেত্রী, অনিতা মাইতিকে সম্পাদিকা ও পুতুল মাইতিকে কোষাধ্যক্ষ করে ৫৩ জনের জেলা কমিটি ও ৪৬ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

মঞ্চে বাঁদিক থেকে কমরেডস্‌ লেখা রায়, সৌমেন বসু, প্রতিভা মুখার্জী ও মানব বেরা

পানীয় জল ঃ সরকারি টাকা জলে

বোতল ভর্তি 'বিশুদ্ধ' পানীয় জলের বিশাল বাজারটা এখন প্রধানত মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি কোক-পেপসির দখলে। শহর কলকাতা সহ দেশের প্রধান মহানগরীগুলি এবং মফঃস্বলের শহরগুলিতে দোকানে দোকানে থরে থরে সাজানো কিন্‌লে, অ্যাকোয়াফিনা বা বিসলেরির বোতল। অন্যদিকে এ রাজ্যে সি পি এম ফ্রন্ট সরকার বহু প্রশংসিত 'যৌথ উদ্যোগে' শুশুনিয়া নাম দিয়ে মিনারেল ওয়াটারের যে কারখানা খুলেছিল তা বন্ধ, লক্ষ লক্ষ টাকাও সেই সঙ্গে গায়েব হয়ে গিয়েছে। সংবাদে প্রকাশ — 'অভিযোগ খুবই গুরুতর। পরিচালকদের একাংশ, যারা ৪০ লক্ষ টাকা তছরুপ করেছে, সি পি এমের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।' (দ্রঃ হিন্দুস্থান টাইমস, ২৭-১১-০৩)

অতি সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের সর্বভারতীয় কনভেনশনের স্বেচ্ছাসেবকরা এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখে পড়েছিলেন। ইরাক এবং প্যালেস্টাইনের ওপর মার্কিন ও ইজরায়েলি হামলার বিরুদ্ধে আহূত এই কনভেনশনে কোক-পেপসি বা অন্য সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানি বাদে আর কারো জল কিনতে গিয়ে অভিজ্ঞতা হল, বাজারের প্রায় সবটাই কোক-পেপসির দখলে। বিকল্প জল কিনতে হয়েছে বহু কষ্টে, নানা দোকান থেকে দু-চার-দশ বোতল করে খুঁজে খুঁজে। তখন জানা যায়, মাদার ডেয়ারির উৎপাদন বন্ধ। কিন্তু রাজ্য সরকারের তৈরি শুশুনিয়া মার্কা বোতল বাজারে নেই কেন? দোকানদাররা সদুত্তর দিতে পারেননি।

শুশুনিয়া জল সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে সি পি এমেরই একাংশ। কাজেই একে শত্রুপক্ষের মিথ্যাপ্রচার বলে ওড়ানো যাবে না। সংবাদে প্রকাশ, সি পি এমের বাঁকুড়া পার্টি ইউনিট দুর্নীতির বিষয়টি আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের পার্টি নেতৃত্বকে জানায়। সি পি এম নেতারা এখন দু-বেলা বেসরকারি উদ্যোগের কর্মসংস্কৃতির উচ্চপ্রশংসা করে থাকেন। বাস্তবে কুকর্মের অপসংস্কৃতিটিও তাদের ভালই আয়ত্তে। শুশুনিয়া জল তৈরির যৌথ কোম্পানি বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ৭২ লক্ষ টাকা ঋণ নেয়। জল পরিশোধনের প্ল্যান্ট বসানোর আগেই ৩০ লক্ষ টাকা শেষ হয়েছে। বাকি ৪২ লক্ষ টাকার হিসাবও পরিচালকরা দিতে পারেননি। বাজারে এলে যে জল কোক-পেপসির বিকল্প হতে পারত, বাজারে তা পাওয়াই যায় না। 'বিকল্প' অর্থনীতির প্রচারক সি পি এম এমনি করেই সরকারি টাকা জলে ঢেলেছে। অবশ্য এক্ষেত্রে তাদের দ্বিচারিতার অভিযোগ তোলা যাবে না। কারণ ইরাকে মার্কিন হানার পটভূমিতে দুনিয়াজোড়া কোক-পেপসির প্রতীকী বয়কটেও তো তারা রাজি হয়নি। তাদের মতে আজকের বিশ্বায়নের জগতে সাম্রাজ্যবাদী পণ্যের বয়কট নেহাতই আহম্মকি!

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল অবস্থার প্রতিবাদে বসিরহাট শহরে নাগরিক কনভেনশন

গত ২৩ নভেম্বর বসিরহাট মহকুমা শহরে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির উদ্যোগে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে মূল প্রস্তাব পেশ করেন ডাঃ মানব ভট্টাচার্য। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন — ডাঃ তপন মণ্ডল, ডাঃ জালাল উদ্দিন আহমেদ, ডাঃ লোকেশ চন্দ্র মালী, বিশিষ্ট শিক্ষক দেবপ্রসাদ ভঞ্জ চৌধুরী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কনভেনশনে প্রধান বক্তা ডাঃ সুজিত চৌধুরী রাজ্য সরকারের জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতির স্বরূপ তুলে ধরে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট নাগরিক অমল কুমার মজুমদার। আগামী দিনে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য অমলকুমার মজুমদারকে সভাপতি এবং ডাঃ মানব ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে ১৭ জনের মহকুমা কমিটি গঠন করা হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুর স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির

অবস্থান ডেপুটেশন

সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির ডাকে ২১ নভেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাসক দপ্তরের সামনে শতাধিক যুবক-যুবতী গণঅবস্থান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। উপযুক্ত আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, ঋণী বেকারদের উপর থেকে সমস্ত মামলা প্রত্যাহার, সমস্ত শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ, সমস্ত বন্ধ কলকারখানা খোলা সহ ১০ দফা দাবিতে এই অবস্থান মঞ্চে বক্তব্য রাখেন চণ্ডী হাজরা, মেঘনাদ ত্রিপাঠী, বাসুদেব সামন্ত, ঝণ্টু নায়ক, মানিক পড়িয়া, অশ্বিনী সেন, ভানুরতন গুঁইন, পঞ্চানন প্রধান, অমল মাইতি, নন্দদুলাল দাস প্রমুখ। অবস্থান আন্দোলন পরিচালনা করেন জগন্নাথ হাজরা। অবস্থান মঞ্চ থেকে এক প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়।

ঢালাও মদের লাইসেন্স

একের পাতার পর

ধরেই করে এসেছে। তাদের এই ভূমিকাকে মানুষ ঘৃণা করলেও, বিস্মিত হয়নি। কারণ, মানুষ বুঝে নিয়েছিল যে, যত সমাজজীবনে নৈতিক অধঃপতন ঘটবে, ততই যুবকদের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মন, প্রতিরোধের তেজ ও নৈতিকতা নষ্ট হবে এবং এতেই দক্ষিণপন্থী রাজনীতির সুবিধা। কারণ বর্তমান অন্যায়-অরাজক-অনৈতিক সমাজব্যবস্থাকেই তারা টিকিয়ে রাখতে চায়, সেই ব্যবস্থারই তারা ধারক ও রক্ষক। ছাত্র-যুবকদের নৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে, আজ দেখা যাচ্ছে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারও আদৌ চিন্তিত নয়। বরং এই সরকারি অপচেষ্টার বিরুদ্ধে নানাস্থান থেকে যতটুকু প্রতিবাদ আসছে, নানা স্কুল-কলেজ ও পাড়ার মানুষরা এভাবে ঢালাও মদ বিক্রির বিরুদ্ধে যতটুকু বাধা গড়ে তুলছেন, তাতেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ক্ষিপ্ত হচ্ছেন। কারণ দেশের যুবশক্তি নেশাগ্রস্ত হলে নৈতিকতা খোয়ালে সি পি এমের তাতে আজ কোন ক্ষতি নেই।

দেশের চতুর্দিকে আজ হতাশার কালোছায়া, লক্ষ লক্ষ কলকারখানা বন্ধ, অফিস-আদালত-ব্যাঙ্ক-বীমা সর্বত্রই এখন শুধু ছাঁটাই-এর নোটিশ। কর্মহীন শ্রমিক পরিবারগুলি হতাশায় আত্মহত্যা করছে। ছাত্র-যুব সমাজ হতাশায় পাগল হচ্ছে, না হয় অসামাজিক ক্রিয়াকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। মানুষ ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ-বিক্ষোভে ফুঁসছে। শুধু লাঠি-গুলি দিয়ে অত্যাচার চালিয়ে মানুষের প্রতিবাদী আন্দোলনকে দমন করা যায় না। তাই সব দেশের শোষক শাসকরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বুঝেছে, মানুষের বিবেক-মনুষ্যত্ব ও নৈতিক চরিত্র মেরে দিতে না পারলে, মানুষকে বিপ্লবী আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে রাখা যাবে না।

সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারও পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষায় সেই পথই নিয়েছে। তাই মাদকদ্রব্য সহ অশ্লীল নাটক, সিনেমা, পর্নোগ্রাফির ব্যাপক প্রসার, এসব কোন কিছুতেই তাদের আপত্তি নেই। একচেটিয়া মালিকশ্রেণীর সেবাদাস হিসাবে তারা আজ যে রাজনীতি চর্চা করছে, তাতে যুবশক্তির অধঃপতন ঘটলে তাদের সুবিধা ছাড়া অসুবিধা হবে না। তাই দেশের ছাত্রযুবশক্তির নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার সামগ্রিক বুর্জোয়া পরিকল্পনা — যা কংগ্রেস, বিজেপি বা অন্যান্য শাসকদল রাজ্যে রাজ্যে রূপায়িত করছে — সি পি এমও এ রাজ্যে তাদের পদাঙ্কই অনুসরণ করছে। তাই মন্ত্রী-আমলাদের বিলাস, দুর্নীতি, অপচয় বন্ধ করে অর্থসংস্থানের পথে না গিয়ে তারা মদ্যপানের প্রসার ঘটিয়ে সরকারি তহবিল ভরাতে চাইছে। এতে এক ঢিলে তারা দুই পাখিই মারতে পারবে। অর্থও মিলবে, আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার নৈতিক মেরুদণ্ডও ভেঙে দিতে পারবে। তাদের তথাকথিত বামপন্থারও অধঃপতন কতদূর হয়েছে, এই পদক্ষেপ তার প্রমাণ।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের পরীক্ষার রুটিন ঘোষণা

কলকাতা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ২৪ নভেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের (পঃবঃ) সভাপতি ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদক কার্তিক সাহা ২০০৩-০৪ বর্ষের ৪র্থ শ্রেণীর (বৃত্তি) পরীক্ষার রুটিন ঘোষণা করেন। এই পরীক্ষায় নাম অন্তর্ভুক্তির ফর্ম জমা দেওয়ার শেষতারিখ ১৮-১২-০৩। পরীক্ষা হবে ২৩-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪।

২৩ ফেব্রুয়ারি — মাতৃভাষা সাহিত্য	২৪ ফেব্রুয়ারি — গণিত
২৫ ফেব্রুয়ারি — ইতিহাস-ভূগোল	২৬ ফেব্রুয়ারি — বিজ্ঞান
২৭ ফেব্রুয়ারি — ইংরাজি।	

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিশেষ কৃতী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, গত বছর ৫০০ জন ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হয় যার অর্থমূল্য সাড়ে তিন লক্ষ টাকা।

পর্ষদের সভাপতি ও সম্পাদক রাজ্যের সমস্ত শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন — প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরাজি পাঠ চালু ও পাশ-ফেল প্রথা চালু করার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টিতে তাঁরা যেন এগিয়ে আসেন।

বিশ্বায়নের নয়া আর্থিক নীতি
ফ্যাসিস্ট কর্পোরেট নীতির বিশ্বায়ন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আমেরিকা দেখাতে চেয়েছে ১১ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ঘটনার পর সে খুবই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। এটা ডাহা মিথ্যা কথা। ৭ সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ ১১ সেপ্টেম্বরের মাত্র চারদিন আগে আমেরিকার আর্থিক চিত্রটা কেমন ছিল ? ২০০১ সালের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে মোট জাতীয় উৎপাদন (GDP) গিয়ে দাঁড়ায় ০.২%-এ। পরপর সাত বার সুদের হার কমিয়েও এই ক্রম অবনতি ঠেকানো যায়নি। শুধু আগস্ট মাসেই উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে চাকরি খোয়া যায় ৮ লাখ লোকের। এক মাসে বেকারির হার ৪.৫% থেকে বেড়ে হয়ে গেল ৪.৯%। আর ১১ সেপ্টেম্বরের পর শুধু বিমান চলাচল ক্ষেত্রেই ১ লাখ কর্মীকে কাজ থেকে বসিয়ে দিতে হল। শেয়ার দর পড়ে গেল ১৫%। আই.টি (I.T.) শেয়ার দরের পতন ১১%। বিশ্বের এই সর্বাপেক্ষা ধনী দেশটিতে এখন ৪ কোটিরও বেশি মানুষ দু'বেলা পেটভরে খেতে পায় না। কারণ, খাদ্য যোগাড় করার মতো আয় তাদের নেই, কাজ নেই। বেকারভাতাও যারা পায়, তা দিয়ে পরিবারের সকলের পেট ভরে খাবার বেশি দিন জোটানো যায় না।

বুর্জোয়া পণ্ডিতরা কথায় কথায় জাপানের উদাহরণ টেনে বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির ঐ দেশের হাল কী ? জাপানি বোমা ফেটে গেছে। গত এক দশক ধরে চলছে চূড়ান্ত মন্দা। ১৯৭৯-তে মোট জাতীয় উৎপাদনে ধবস নামে। উৎপাদন বাড়ার বদলে ০.৭ শতাংশ কমে গেছে। ১৯৯৮-তেও ছিল একই হাল। খনি ও উৎপাদন ক্ষেত্রেও তাই। বড় বড় ব্যাংকগুলো দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে।

এবার দেখুন, তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ জার্মানিকে। তার অবস্থাও করুণ। লাগাতার মন্দার কারণে চলছে লাগাতার ছাঁটাই, মন্দা আর ক্রমহ্রাসমান মুনাফার হাত থেকে বাঁচতে। দক্ষিণ কোরিয়া তার 'মাইনাস গ্রোথ' নিয়ে ধুঁকছে, ফ্রান্সও তাই। আর এই প্রত্যেকটি দেশকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কতগুলো পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে — যা ভারতবর্ষের মতোই।

"জনগণের দ্বারা, জনগণের স্বার্থে, জনগণের জন্য'' পরিচালিত পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র রূপান্তরিত হয়েছে কর্পোরেটের গণতন্ত্রে, অর্থাৎ, একচেটে পুঁজিপতিদের দ্বারা, একচেটে পুঁজিপতিদের স্বার্থে, একচেটে পুঁজিপতিদের জন্য গণতন্ত্রে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কর্পোরেটদের গণতন্ত্রের বজ্র আঁটুনি। শ্রমজীবী জনতার ওপর চাপিয়ে দেওয়া একচেটে পুঁজির একনায়কত্ব, অর্থাৎ কর্পোরেট রাষ্ট্র, কর্পোরেট অর্থনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ডব্লু টি ও-র নেতৃত্বে চলছে বিশ্বকে ঢেলে সাজানো। দেশে দেশে উত্তাল শ্রমিক-কর্মচারী-ছাত্র-শিক্ষক — সর্বস্তরের মানুষ আন্দোলনে বন্যার মত আছড়ে পড়ছে। মিছিলে আওয়াজ উঠছে, 'বিশ্বায়ন নিপাত যাক', 'পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক'। আর পুঁজিবাদ আত্মরক্ষার তাগিদে কর্পোরেট রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ধাঁচাকে মজবুত করে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় দমনের শক্তিকে সংগঠিত করতে ফ্যাসিবাদী কর্পোরেট নীতিকে হাতিয়ার করছে। ডব্লুটিও হয়ে উঠেছে তারই হাতিয়ার — সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিকল্পনার রচনা ও রূপায়ণের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দু।

ইতালি, জার্মানি, গ্রেট ব্রিটেনের বা আমেরিকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগের অবস্থাটা যদি একটু তুলনা করে নেওয়া যায়, বর্তমান সংকটের গভীর তাৎপর্য আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই ঐতিহাসিক সাদৃশ্য একদিকে যেমন বিস্ময়কর, তেমনি ভীতিপ্রদ।

ইতালির প্রখ্যাত সংবাদপত্র ক্যুরিয়ার ডেলা সেরা সেদিন লিখেছিল ঃ ১৯২৭-এর জুন থেকে ১৯২৮-এর ডিসেম্বর — এই ক'মাসে মজুরদের ২০ শতাংশ মজুরি কমে গেছে। ১৯২৯-এর পর আরও ১০ শতাংশ মজুরি কমিয়ে আনা হল। ১৯৩০-এর নভেম্বরে সাধারণভাবে মজুরি হ্রাস ঘটেছে, কোথাও কোথাও ১৮%, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে ২৫%। ১৯৩১-এর পর মজুরির পুনর্বিন্যাস ইত্যাদি কায়দায় মজুরি আরও কমানো হয়েছে।

জার্মানি ও ইতালিতে ফ্যাসিস্ট জমানার উত্থানের বিষয়ে প্রখ্যাত সাংবাদিক-লেখক সালভিমিনির নিজের হিসাব হল, ১৯২৬ থেকে ১৯৩৪ সাল — এই ক'টা বছরে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে ফ্যাসিস্ট মুসোলিনি বেশ গর্বের সঙ্গে বলেছেন ঃ সৌভাগ্যের বিষয় হল, ইতালির মানুষের দিনে একাধিকবার খাওয়ার অভ্যাস নেই — কাজেই এদের জীবনযাত্রার মান এত নিচুতে যে, এরা অভাব ও দারিদ্র্য অনুভব করে অনেক কম। অনুরূপভাবে ভারতের রাষ্ট্রনায়করাও গর্ব করতে পারেন। কারণ, পার্লামেন্টের প্রশ্নোত্তরে জানা যায়, ২৬ কোটি মানুষ এদেশে একবেলা মাত্র খেতে পায়।

ফ্যাসিস্ট ইতালিতে ব্যক্তিগত শিল্প উদ্যোগীদের ভুলভ্রান্তির খেসারত দিয়েছে রাষ্ট্র বা করদাতারা। লাভ হল ব্যক্তিগত, ক্ষতির দায় সমাজের — জনগণের, 'চার্টার অফ লেবার' এই সত্য প্রকাশ করেছে। ইতালি হয়ে উঠেছিল তথাকথিত 'শিল্পে শান্তি'র দেশ। রোমে অবস্থিত প্রাক্তন মার্কিন বাণিজ্যিক প্রতিনিধি ১৯২৯ সালে বলছেন ঃ ইতালিতে আর শ্রমবিরোধ বলে কিছু নেই। ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে জেলে পোরা হয়। 'স্যাটারডে ইভনিং পোস্ট' পত্রিকাটি লিখছে ঃ ১৯২৬ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত শিল্পসায়রে শ্রমিক বিক্ষোভের একটি বুদবুদও উঠতে দেখা যায়নি। শিল্পে শান্তির দেশ হয়ে উঠেছে ইতালি। ১৯২৫ সালের ১২ অক্টোবর ফ্যাসিস্টদের সদর দপ্তর ভিডোনি প্রাসাদে শ্রমিক ইউনিয়ন ও মালিকদের মধ্যে চুক্তি হয়। তার নাম ভিডোনি প্রাসাদ চুক্তি। চুক্তির ফলে ঠিক হয়, মালিকরা ফ্যাসিস্ত ইউনিয়নগুলিকেই স্বীকৃতি দেবে। ১৯২৬-এর ৬ অক্টোবর ফ্যাসিস্টদের গ্র্যান্ড কাউন্সিল তাকে সমর্থন জানায়। আর শর্ত জুড়ে দেয় — ধর্মঘট বেআইনি।

ইতালিতে এই মালিক-মজুর সহযোগিতার চেহারাটা কেমন ছিল ? আইনত ধর্মঘট নিষিদ্ধ হয়ে গেল। ধর্মঘট নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে, নাকি তা সমর্থনসূচক — সেটা হিসেব করে শাস্তির রকমফের আছে। সরকারি বা বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান — যেখানেই হোক, ধর্মঘট করার সর্বোচ্চ শাস্তি ৭ বছরের জেল। স্ট্রাইকের সাথে লকআউটও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। ধর্মঘট করার অধিকারটাই যখন নেই, তখন লকআউটের দরকারও নেই। যদি কোন শিল্পপতি মনে করে, বর্তমানে যত লোক নিয়ে কাজ করা হচ্ছে তত দরকার নেই, তাহলে সে যথেচ্ছ ছাঁটাই করবে, দরকারে কাজ বন্ধ করে দেবে। এটাকে আর লকআউট বলা যাবে না। স্মরণ করুন, কেন্দ্রীয় সরকারি ঘোষণায় ১০০০ শ্রমিকের কারখানায় ছাঁটাই-লকআউটে ভারতবর্ষে এখন অনুমতি লাগে না। বন্‌ধ ও ধর্মঘটের অধিকার সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মধ্যে সেই ফ্যাসিস্টদের প্রতিধ্বনি কি শোনা যাচ্ছে না ? ছাঁটাই করার, লকআউট করার অবাধ অধিকার ফ্যাসিবাদী শাসনের কালো সেই দিনগুলিকেই মনে করায় না কি ? 'শিল্পে শান্তি'র আওয়াজ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তুলেছে। এর দ্বারা কোন ভবিষ্যতের পটভূমি রচনা করা হচ্ছে, বুঝতে অসুবিধা হয় কি ?

সালভিমিনির লেখায় ইতালির পত্রিকা 'লাভ্রেন দ্য ইতালিয়া'র মন্তব্যে পাওয়া যায় ঃ 'এটা এখন সবাই বুঝে নিয়েছে যে, মালিকরা শ্রমিকদের সংখ্যা বা কাজের ঘন্টা ছাঁটাই করতে পারে, আর এইজন্য লকআউট বা ক্লোজারের দরকারই তাদের হয় না। ভাবতেই হয়, ভারতবর্ষও কি সেই দিকেই যাচ্ছে ? এমনই এক সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার গৌরবে ফ্যাসিস্ট মুসোলিনি বাণী দিলেন ঃ "আমেরিকায় স্ট্রাইক হয় কেন ? আমাদের ইতালিতে এ সবের আর কোন প্রয়োজন নেই। আমরা স্ট্রাইক ও লকআউট দেশ থেকে হটিয়ে দিয়েছি।'' আজ অন্যান্য রাজ্যের কথা বাদই দিলাম, এই পশ্চিমবঙ্গে তথাকথিত বামপন্থীদের রাজত্বে 'স্ট্রাইক' প্রায় বিদায় নিতে চলেছে। লকআউটের দাপটে শ্রমিক কর্মচারীরা বিপর্যস্ত। আজ মুসোলিনি নামটার জায়গায় যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এবং তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীদের নামটা বসিয়ে দেওয়া যায়, তবে বক্তব্যে মৌলিক পার্থক্য দেখা যাবে কি ?

পল আইনজিগ — নামজাদা বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের কট্টর সমর্থক, তিনি ইতালির তৎকালীন এই অবস্থা দেখে বললেন ঃ মজুরি কমানোর ব্যাপারে মজুরদের কাছ থেকে (ইতালিতে) সম্মতি আদায় করা যত সহজ — এমন আর কোন দেশেই হয় না। তিনি অবশ্য বেঁচে থাকলে এমন অহঙ্কার এখন আর করতে পারতেন না। উত্তরবাংলায় চা-বাগানের শ্রমিকরা যেমন ৬ দিন কাজ করে ৩ দিনের বেতন নিচ্ছে, বন্ধ চা বাগানের শ্রমিক পরিবার খাদ্যের অভাবে মরছে, চটকল শ্রমিকদের বিরাট অংশই তাই করছে। ৩০ হাজার শ্রমিক সংখ্যা কমার পর ৩.৫ লাখ টন উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে।

কর্পোরেট রাষ্ট্রের তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে ফ্যাসিস্ট মুসোলিনি বললেন ঃ"কর্পোরেট রাষ্ট্রব্যবস্থা কি অন্যান্য দেশেও প্রযোজ্য হতে পারে ? আমি মনে করি, এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। যেহেতু পুঁজিবাদ আজ সাধারণ সংকটের মধ্যে রয়েছে — কর্পোরেট রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই একমাত্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যা অন্যান্য দেশকেও গ্রহণ করতে হবে।" হয়েছেও তাই। বর্তমান স্থায়ী সংকটের আবর্তে পুঁজিবাদী সর্বাত্মক সংকটের পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত তাগিদ থেকেই দেশে দেশে পুঁজিবাদ কর্পোরেট রাষ্ট্রের রূপ নিয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে জন্ম নিয়েছে ডব্লুটিও-র মতো কর্পোরেট সংগঠন যা বিশ্বায়নের নামে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার আয়োজনকে একটা সুসংহত সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করেছে।

কর্পোরেট নীতির মাধ্যমে দেশে দেশে পুঁজিবাদের ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ ধরতে পেরেছিলেন। ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য, রূপ ও মর্মবস্তুকে, দার্শনিকভাবে বিচার করে তার বিশেষীকৃত ও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা তিনি তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি দেখান ঃ "মানবতাবাদী মানসিকতাই আজ বিপ্লবভীতির দরুণ সর্বহারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান সংগঠিত করার উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ফ্যাসিবাদের আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত ভিত রচনা করেছে।" কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির মধ্যে ইতিমধ্যেই এর প্রতিচ্ছবি কি পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি? পুঁজিবাদের সংকটের গর্ভেই ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান ঘটছে। অল্প কথায় কর্পোরেট গণতন্ত্রের মূলনীতি পাওয়া যায় ইতালীয় লেবার চার্টারে ঃ "১৯২৭ সালে ইতালীয় শ্রমসংক্রান্ত সনদে উল্লেখিত মূল নীতিগত প্রামাণ্য নথিতে বলা হয়েছিল ঃ কর্পোরেট রাষ্ট্র মনে করে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে "ব্যক্তিগত উদ্যোগ" হল জাতির হাতে সবচেয়ে কার্যকরী এবং মূল্যবান হাতিয়ার।"(১)

বেসরকারীকরণের স্লোগানের তাৎপর্য এখানেই।

ফ্যাসিস্ট নেতা পল আইনজিগ তার 'ইকনমিক ফাউণ্ডেশন অফ ফ্যাসিজম্'-এ লিখছেন ঃ "ব্যক্তিগত মালিকানাই হল মূল, রাষ্ট্রীয় মালিকানা ব্যতিক্রমমাত্র।"(২) আর এ ব্যাপারে সরকার কি করবে ? ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকবে ? না। "ব্যক্তিগত উদ্যোগের বিকল্প হিসাবে কাজ করার অধিকার সরকারের আছে।"(৩) ভারতবর্ষে আজ এটাই কি হচ্ছে না ? উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও একই জিনিস হচ্ছে। কর্পোরেট রাষ্ট্রের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য দেখাতে আমরা ব্রিটেনের উদাহরণ টানছি ঃ "বেতনভোগী ও ঠিকা মজুরির শ্রমিকের মধ্যে অনুপাতের হার কি তা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ....১৯২৪ সালে বেতনভোগী কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ২৮ লক্ষ এবং ঠিকা মজুরির শ্রমিক ১ কোটি ৫৪ লক্ষ। মোট শ্রমিক কর্মচারীর ১৫ শতাংশ ছিল বেতনভোগীরা।"(৪)

[১, ২, ৩, ৪ উদ্ধৃতির সূত্র ঃ রজনী পাম দত্ত, Fascism & Social Revolution.]

আজ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিসহ ভারতবর্ষে যেন এরই কার্বনকপি রূপায়িত হচ্ছে।

মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখালেন ঃ "রাষ্ট্রব্যবস্থার দিক থেকেও ফ্যাসিবাদ কোন নির্দিষ্ট প্যাটার্নের বদলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয় ... কোথাও ব্যক্তি একনায়কত্ব, কোথাও মিলিটারি জুন্টার স্বেচ্ছাচারী শাসন, আবার কোথাও পার্লামেন্টের অস্তিত্ব বজায় রেখেই, কিন্তু তার ক্ষমতা কমিয়ে এনে — রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে গণতান্ত্রিক সরকারের আদলটা বজায় রেখেই ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েমের ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে একটা অভূতপূর্ব অভিনব অভিজ্ঞতা। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আদল থাকার জন্য এর দ্বারা লোক ঠকানো আরও সহজ হয়।" সুতরাং প্রমাণিত হচ্ছে, কর্পোরেট রাষ্ট্রনীতি আসলে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রনীতি। কর্পোরেট গণতন্ত্র অর্থাৎ কর্পোরেট সংস্থাগুলির গণতন্ত্র হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব। ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের নেতা

সাতের পাতায় দেখুন

কালা দিবস পালন করল হকার সংগ্রাম কমিটি

১৯৯৬ সালের ২৪ নভেম্বর রাজ্য সরকার ‘অপারেশন সানসাইন’ নামে কলকাতায় রাতের অন্ধকারে ফুটপাথ থেকে গরিব হকারদের দোকানপাট ভেঙ্গে, লুঠ করে, অত্যাচার চালিয়ে উচ্ছেদ করেছিল। ২৪ নভেম্বর কালাদিবসকে এবার হকার সংগ্রাম কমিটি রাজ্যব্যাপী বিশ্বায়নবিরোধী দিবস হিসাবে পালন করে। ২৪ নভেম্বর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হকার, ঝুপড়িবাসী সহ উচ্ছেদ হওয়া মানুষরা দলে দলে শহিদ মিনারের সমাবেশে যোগদান করে। এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটেকার, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী’র রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা, হকার সংগ্রাম কমিটির নেতা শক্তিমান ঘোষ প্রমুখ। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার তুষার তালুকদার। এই সমাবেশের পর কয়েক হাজার মানুষের এক সুসজ্জিত মিছিল শহিদ মিনার থেকে কলেজ স্কোয়ারে যায়। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন মেধা পাটেকার। হকার সংগ্রাম কমিটির নেতা বিধান চ্যাটার্জী, তপন মিত্র এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা।

হকার সংগ্রাম কমিটির এক নেতা বলেন, ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের প্রথম শিকার কলকাতার হকাররা। এরপর বহু রক্তঝরানো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে হকারদের জাতীয় নীতি এবং অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা বিল।

এই সমাবেশ ও মিছিলে দাবি তোলা হয় — বিশ্বায়নের নামে সংগঠিত, অসংগঠিত শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে, শহর থেকে গরিব খেটে খাওয়া মানুষের উচ্ছেদের পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে, শহর উন্নয়নের পরিকল্পনায় গরিবদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে, গরিব স্বনিযুক্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের সরকারি স্বীকৃতি দিতে হবে, হকার সহ অসংগঠিত শ্রমিকদের সরকারি স্তরে সবরকম সুরক্ষা দিতে হবে।

২৪ নভেম্বর শহিদ মিনারের সমাবেশে ভাষণরত কমরেড শংকর সাহা

কমরেড বিমল নাথের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই হাওড়া জেলার বেলুড় আঞ্চলিক কমিটির সদস্য কমরেড বিমল নাথ গত ২৬ নভেম্বর ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যাণ্ড হসপিটালে বেলা ১১টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জটিল নিউমোনিয়া ও কার্ডিও রেসপিরেটরী ফেলিওর তাঁর মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছালে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। আঞ্চলিক অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়। মরদেহ বেলুড় আঞ্চলিক অফিসে আনা হলে দলের রাজ্য কমিটির সদস্য এবং জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড শঙ্কর রায়চৌধুরী, সারা ভারত ডি এস ও’র সাধারণ সম্পাদক কমরেড দেবাশীষ রায় মরদেহে মাল্যদান করে তাঁদের বৈপ্লবিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। বিভিন্ন গণসংগঠন এবং প্রয়াত কমরেডের কর্মস্থল পি কে ইলেকট্রিকের কর্মীরাও মাল্যদান করেন। এরপর মরদেহ নিয়ে শোকমিছিল আন্তর্জাতিক সঙ্গীত সহকারে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

১৯৭২ সালে কমরেড বিমল নাথ সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর শিক্ষায় সারা জীবন নিরন্তর সংগ্রাম করে গেছেন। পার্টির প্রতি শর্তহীন আনুগত্য, দলের কাছে কোনও কিছু গোপন না করা, সর্বদাই নেতৃত্বের নির্দেশিত পথে চলার চেষ্টা করাই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

কমরেড বিমল নাথ লাল সেলাম

মালিকশ্রেণীর স্বার্থে আপসের কানাগলি দেখাচ্ছে

একের পাতার পর

লড়াকু ভাব দেখাতে গিয়ে সিটু নেতাদের খুব সতর্কভাবে শব্দ চয়ন করতে হয়েছে। দেখাতে হয়েছে শ্রমিকরা যেন তাদের চালাকি ধরে ফেলতে না পারে, আবার শ্রমিক ঠকানো গরম-গরম বুলি শুনে মালিকরা যেন ভুল না বোঝে। একেই লেনিন বলেছেন সোস্যাল ডেমোক্র্যাসি — যা মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ায়, কিন্তু কাজ করে পুঁজিবাদের স্বার্থে।

মালিকদের সভায় গিয়ে সি পি এম নেতারা বলে আসছেন তাঁরা জঙ্গি আন্দোলন করবেন না। শ্রমিকদের সভায় এই কথাটাই ঘুরিয়ে তাঁরা বলছেন, ‘আমাদের লড়ায়ের সুযোগ অনেক সীমিত। শ্রমিকশ্রেণী এখন আত্মরক্ষামূলক লড়াই করছে। পরিস্থিতির চাপে আমাদের অনেক কিছু মেনে নিতে হচ্ছে, যা নীতিগতভাবে আমরা মানিনা’ — বলেছেন সিটু নেতা চিত্তব্রত মজুমদার। তিনি আরও বলেছেন —‘পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কখনোই এস্‌পার-ওসপারের আন্দোলন নয়। আপসের আন্দোলন। আবার আক্রমণ যখন ঠেকাতে পারছি না তখন প্রতিবাদ-প্রতিরোধের দরকার নেই, মেনে নেওয়াই ভালো — এটাও ঠিক নয়। তাই কোন স্তর অবধি প্রতিরোধ করবো — এটা বোঝা দরকার। কোন জায়গায় গিয়ে সূতো ছিঁড়ে যাবে উলটো ফল হবে, তা উপলব্ধির মধ্যে থাকা দরকার! এবং সেখানেই আপস করতে হবে। কোথায় গিয়ে থামতে হবে, এই বোধ আমাদের থাকা দরকার।” (গণশক্তি ২৪.১১.০৩)

শ্রমিক আন্দোলন তীব্র হলে কীসের সূতো ছিঁড়বে? একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠীর সঙ্গে সি পি এমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূতো! শ্রমিক আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার প্রশ্নে কংগ্রেস বিজেপির মতো দলের সঙ্গে সমমনস্ক সম্পর্কের সূতো! যে শ্রমিকের ঘরে খাদ্য নেই, রোগে ওষুধ নেই, বেঁচে থাকার কোন নিশ্চয়তা নেই, কার্ল মার্কসের ভাষায় — “শৃঙ্খল ছাড়া যাদের হারাবার কিছু নেই” — ছেঁড়বার মতো সম্পর্কের সূতোই বা তার কোথায়?

এত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বার বার “বুঝে চলার” উপদেশ তাঁদের দিতে হচ্ছে কেন? কারণ তাঁরা জানেন, পুঁজিবাদী শোষণের ফলে শ্রমিকদের যে অবর্ণনীয় দুর্দশা তাতে, বেঁধে রাখতে না পারলে শ্রমিক আন্দোলন আপন নিয়মে ফেটে পড়বে, এবং সেই লড়াই সংগ্রামী, সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্ব গড়ে ওঠার অনুকূল জমি হিসাবে কাজ করবে। প্রধানত, ইউ টি ইউ সি এল এসের উদ্যোগে বিরোধী কয়েকটি ইউনিয়নের যৌথ প্রতিরোধে পাটশিল্পে কালাচুক্তি সই করেও সিটু নেতৃত্ব সব চটকলে তা কার্যকর করতে পারেনি। কারখানায় কারখানায় সিটু ইউনিয়নের এত বোল্‌ বোলাও যে মালিকদের প্রত্যক্ষ মদতে — অন্তত নেতাদের তা অজানা নয়। তাঁরা এবং মালিকশ্রেণী উভয়েই জানে লাগাম যদি সিটুর হাতে না থাকে তবে শ্রমিক আন্দোলনকে আজ আর রোখা যাবে না। তাই মালিকরা বহুক্ষেত্রে শ্রমিকদের বলছে — তোমরা সিটু করো।

সিটু নেতারা কী করছেন? তাঁরা প্রথমে মালিকদের ভয়ঙ্কর আক্রমণের ভীতিজনক ছবিটা রাখছেন; বলছেন — ‘মালিকরা একতরফা আক্রমণ চালাচ্ছে, কোন আইন মানছে না’, বলেই বলছেন — এখন আত্মরক্ষার লড়াই। অর্থাৎ মালিককে না চটিয়ে, সিটুকে বিপদে না ফেলে, মালিকের কেটে দেওয়া গণ্ডির মধ্যে হাত-পা ছোঁড়, তারপর সিটু নেতারা এসে আপস করিয়ে দেবে। কিন্তু এভাবে কি শ্রমিক বাঁচবে?

ইতিহাস বলছে — না বাঁচবে না। অত্যাচারীর সাথে, শোষকের সাথে আপস করে শোষিত মানুষ কোন যুগে বাঁচেনি। বাস্তব বলছে — না বাঁচবে না। গত ২৬ বছর সি পি এম রাজত্বে ‘জঙ্গি’ আন্দোলন দূরের কথা কোন আন্দোলনই প্রায় নেই। তা সত্ত্বেও ছাঁটাই-ক্লোজার-লকআউট বাড়ছে কেন? তারাতলার ফিলিপস কারখানা, মেটালবক্স, টালিগঞ্জের জয় ইঞ্জিনিয়ারিং; শ-ওয়ালেস, ডানলপ, গেস্ট কীন উইলিয়ামস-এর মতো কত কারখানা বন্ধ হয়েছে বিশেষ কোন আন্দোলন ছাড়াই। ২৩ তারিখ সিটু সম্মেলন শেষ হওয়ার পরই, কোনরকম আন্দোলন না থাকা সত্ত্বেও ২৪ নভেম্বর রিষড়ার হিন্দুস্থান ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা বন্ধ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গণশক্তিই (২৬.১১.০৩) লিখেছে — “কর্তৃপক্ষের একতরফা সিদ্ধান্তের ফলে সাড়ে সাতশো শ্রমিক-কর্মচারী চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়লেন।” সিটু নেতারা বলছেন, শ্রমিকদের বাস্তববাদী হতে হবে। মার্ক্সবাদী মাত্রেই জানেন, বাস্তব থেকে আমরা কী শিক্ষা নেব তা নির্ভর করে শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির উপর। মালিকশ্রেণীর শোষণের স্বার্থে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে যারা টিকিয়ে রাখতে চায় তারা বাস্তববাদিতার নামে পুঁজিবাদকে ভাঙার শক্তি শ্রমিকশ্রেণীকে দমিয়ে রাখার, শ্রমিক আন্দোলনকে আইনি বেড়ার মধ্যে আটকে রাখার চেষ্টা করে, যে চেষ্টাটা করছে সিটু। তারা বলে কিছু কিছু মালিক খারাপ, যেমন বলেছেন জ্যোতি বসু। তিনি বলেছেন — “কিছু কিছু মালিক আছেন, যাঁরা শ্রমিকদের কোনও অধিকার দিতে চান না। সেখানে তো লড়াই হবেই।” চিত্তব্রতবাবু আরও এক পা এগিয়ে বলেছেন — “আইন মেনে শিল্প পরিচালনা করলে সিটু কি বাধা দিয়েছে।” এসব কথার মধ্য দিয়ে যে সত্য তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীকে ভুলিয়ে দিতে চান তাহল — শ্রমিকশোষণটা কোন ব্যক্তিমালিকের ইচ্ছা অনিচ্ছার বিষয় নয়। মালিক ভালো হলে শ্রমিক আন্দোলন করবে না — এও ইতিহাসের, মার্ক্সবাদের শিক্ষা নয়। মার্ক্সবাদ দেখিয়েছে পুঁজিবাদ দাঁড়িয়ে আছে শ্রমিক শোষণের ওপর। ভালো মালিকও শ্রমিকশোষণ করেই মুনাফা করে। এককালে রাজতন্ত্রের সমর্থকরা ভালো রাজার গুণগান করত রাজতন্ত্রকে রক্ষা করতে। তারা দেখাত মন্দ রাজার জন্যই প্রজাদের যত দুঃখ দুর্দশা। রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজার কাছেই প্রতিকার চাইতে শেখাতো। সিটু এখন পুঁজিবাদকে রক্ষা করতে সেই ভূমিকাই নিচ্ছে। কিন্তু এভাবে শ্রেণীসংগ্রামকে রোখা যায় না। শ্রমিকশ্রেণীর ভেতরে ঢুকে মালিকের দালালদের আপসের চেষ্টা বাস্তবের আঘাতেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদের মৃত্যুবাণ রয়েছে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে — ইতিহাসের এই অমোঘ সত্যকেই তুলে ধরেছে মার্ক্সবাদ।

একথা ঠিক যে, সংগ্রামের দীর্ঘ পথে আন্দোলনের প্রয়োজনেই শ্রমিককে মাঝে মাঝে লড়াই বন্ধ করতে হয়, মালিকের সাথে মীমাংসায় যেতে হয়। এটা সে করে আরও বৃহত্তর, তীব্রতর লড়াই চালাবার মতো উপযুক্ত সাংগঠনিক প্রস্তুতি গড়ে তোলার জন্য। যতদিন এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী উচ্ছেদ না করতে পারছে, ততদিন তাকে লড়াই-মীমাংসা, আবার লড়াই আবার মীমাংসা — এই পথেই যেতে হবে। কিন্তু প্রতিটি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকবে। এই শক্তি, পুঁজিবাদের সেবা করে আরামে ভোগবিলাসে থাকবার শক্তি নয়, পুঁজিবাদকে রক্ষা করার শক্তি নয়, বিপ্লবের মারফত শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার মতো উপযুক্ত সংগ্রামী শক্তি। এইভাবে চলতে চলতে যেদিন সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হবে, যেদিন পুঁজিপতিশ্রেণীর হাত থেকে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার মতো গোটা দেশব্যাপী উপযুক্ত সংগঠন ও শক্তি অর্জন করবে, সেদিন আর মীমাংসার প্রশ্ন থাকবে না। সেদিন শ্রমিকশ্রেণী সরাসরি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করবে। ফলে সরকার রক্ষা, পুঁজিবাদী সমাজকে রক্ষা, শ্রমিক নেতাদের মৌরসী পাট্টা রক্ষা, মালিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিক আপস করেনা। অথচ এমন ধরনের আপসের শিক্ষাই দিয়েছে সিটুর অষ্টম রাজ্য সম্মেলন। রাজ্যের সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণী বৃহত্তর, তীব্রতর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এর জবাব দেবেন।

ইরাকে প্রতিরোধ যত বাড়ছে বুশ তত তার 'বিরামহীন যুদ্ধ'কে এশিয়ায় বিক্রি করার চেষ্টা চালাচ্ছে

১১ সেপ্টেম্বরের পর বুশ প্রশাসন যে 'বিরামহীন যুদ্ধে'র ছক কষেছিল তার কর্মসূচির মধ্যে ছিল আফগানিস্তানকে গুঁড়িয়ে দেওয়া, সাদ্দাম হোসেনের সরকারকে ধ্বংস করা এবং এই দুই দেশে যত দ্রুত সম্ভব পুতুল সরকার বসিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনকে শক্তপোক্ত করে তোলা। দেশে দেশে মার্কিনবিরোধী সরকারগুলিকে উচ্ছেদ এবং গণআন্দোলনকে খতম করার লক্ষ্য নিয়ে বুশ 'আগবাড়িয়ে যুদ্ধ' (প্রিএম্পটিভ স্ট্রাইক) অভিযান আরও তীব্র করতে চেয়েছিল।

কিন্তু এই অভিযান বহুল পরিমাণে স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। কারণ, নিজেদের দেশের ওপর নিষ্ঠুর ঔপনিবেশিক দখলদারির বিরুদ্ধে ইরাকি জনগণের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিরোধ। যার ফলে রোজ বেশি বেশি করে মার্কিন সৈন্য মারা যাচ্ছে ও আহত হচ্ছে। এবং ইরাক জুড়ে দখলদারদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ছে।

মার্কিন সৈন্যের হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকায় এবং ভিনদেশে দখল বজায় রাখার আকাশছোঁয়া খরচের ধাক্কায় দেশের মধ্যে বুশের নির্বাচনী সাফল্যের সম্ভাবনার পারদ যখন নীচে নামছে, তখন এর প্রতিক্রিয়ায় প্রশাসন দেশের বাইরের দিকে আরও ঝুঁকছে যাতে তারা ঘরের মধ্যে আবার যুদ্ধের মানসিকতাকে খুঁচিয়ে তুলতে পারে এবং আগ্রাসন ও পৃথিবীর ওপর আধিপত্যের জন্য তাদের অভিযানের সপক্ষে সমর্থনকে আবার চাগিয়ে তুলতে পারে।

এশিয়া সফরে যাওয়ার আগে, ক্যালিফোর্নিয়ার সানবার্নার্ডিনোতে গভর্নর পদপ্রার্থী আর্নল্ড সোয়ার্জেনেগারের সাথে নির্বাচনী প্রচারে বুশ সফরের মূল সুরটিকে গেয়ে রেখেছিলেন। ১৭ অক্টোবর নিউ ইয়র্ক টাইমসের খবর হল, বুশ ঘোষণা করেছিলেন, 'আমেরিকা একটা নতুন স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী চলছে। আমরা আর আমাদের পরবর্তী আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করছি না। আমাদের শত্রুরা আঘাত করার আগেই আমরা তাদের আঘাত করছি।'

কথাগুলির মধ্যে দিয়ে বুশ 'আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ'-র তত্ত্বকেই আর একবার তুলে ধরেছিলেন। এবং সেইসঙ্গে বিশেষ করে এশিয়ার দেশে দেশে হস্তক্ষেপ করার ভিতটাকে তৈরি করেছিলেন। তিনি ফিলিপাইনস ও ইন্দোনেশিয়ার নাম করেছিলেন, কিন্তু খুব সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে হুমকিটার পরিধি আরও ব্যাপক। কারণ, ইরান, সিরিয়া, কিউবা, লিবিয়া এবং উত্তর কোরিয়া সমেত অজস্র দেশকে বুশ ইতিমধ্যেই শত্রু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

কোরিয়ার উপর মার্কিন চাপ

বুশ দক্ষিণ কোরিয়ায় গিয়েছিলেন সে দেশের সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে — যাতে তারা ইরাকে সেনা পাঠায় এবং অক্টোবরের ২৩-২৪ তারিখে আর্থিক সাহায্যদাতাদের মাদ্রিদ সম্মেলনে ইরাকে দখল বজার রাখার জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দেয়। দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি রব মুহিয়ুন নীতিগতভাবে রাজি হন। কিন্তু দেশের জনগণের তীব্র বিরোধিতার আশঙ্কায় কবে ও কত সৈন্য পাঠানো যাবে — তা ঠিক করার জন্য 'জনমত বিবেচনা করা'র শর্ত জুড়ে দেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া অর্থাৎ উত্তর কোরিয়ার ওপর আমেরিকা সামরিক আক্রমণ করবে না এমন এক বহুপাক্ষিক নিরাপত্তার 'গ্যারান্টি'র বিনিময়ে উত্তর কোরিয়া তাদের পারমাণবিক অস্ত্র-কর্মসূচি বাতিল করবে — এই ধরনের এক প্রস্তাবে কোরিয়াকে রাজি করানোর জন্য আমেরিকা যে উদ্যোগ নিয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়া যাতে তাতে সায় দেয় তার জন্যও বুশ চাপ দেন। আপাতভাবে দেখলে মনে হতে পারে এর আগে রামসফেল্ড-চেনি গোষ্ঠী 'কোন আলোচনা নয়' গোছের যে উগ্র লাইন নিয়েছিল — তার থেকে এই প্রস্তাব কিছুটা যেন পিছু হটে আসা। কিন্তু এই প্রস্তাবকে বুশ ও তার প্রশাসনের একটা নয়া চাল বলে ধরে নেওয়া যায় — যার সাহায্যে দেখাতে চায় যে মার্কিন শাসকদের প্রস্তাব 'যুক্তিপূর্ণ'। যদিও প্রস্তাবে তারা ধূর্তভাবে এমন এক প্রস্তাব করছে যা উত্তর কোরিয়ার পক্ষে মেনে নেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। এবং তাহলেই সেদেশের ওপর মার্কিন আগ্রাসনের জমি তৈরি হয়। এর আগে উত্তর কোরিয়া প্রস্তাব করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা 'অনাক্রমণ চুক্তি' করুক এবং মার্কিন সেনেট থেকে তা অনুমোদন করিয়ে আনুক। আমেরিকার নতুন প্রস্তাব উত্তর কোরিয়ার সেই যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়ারই চেষ্টা। অথচ ঘটনা হল, মার্কিন সামরিক বাহিনী ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত উত্তর কোরিয়া ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। এই আক্রমণে ৫০ লক্ষ কোরিয় মারা গিয়েছিল। যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে একটা শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্বীকার করেছিল।

বুশ উত্তর কোরিয়াকে 'শয়তানের অক্ষ' ভুক্ত দেশ বলে অভিহিত করেছেন। এই অক্ষের বাকি দুই সদস্য ইরাক ও ইরান। ইরাক ইতিমধ্যে পেন্টাগণ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় সাঁইত্রিশ হাজার সৈন্য মোতায়েন রেখেছে ওয়াশিংটন। ঐ অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধজাহাজ এবং সামরিক বিমানবহর রয়েছে এবং উত্তর কোরিয়ার ওপর "নিপুণ আঘাত" হানার হুমকি দিয়ে রেখেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই ধরনের চূড়ান্ত হুমকির সামনে মার্কিন আক্রমণকে ঠেকানোর জন্য সামরিক প্রস্তুতির বিনিময়ে উত্তর কোরিয়া যে অনাক্রমণ চুক্তির দাবি করেছে, তা তো একটা নেহাতই ন্যূনতম দাবি।

বুশ ফিলিপাইনসে গিয়ে সে দেশের প্রেসিডেন্ট গ্লোরিয়া মাকাপাগাল অ্যারোয়োর মার্কিন-ঘেঁষা শাসনকে মজবুত করার জন্য আগামী পাঁচ বছরের জন্য সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ ও ট্রেনিং-এর পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর নাম করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেদেশে দেড় হাজার সৈন্য মোতায়েন রেখেছে এবং ঐ দেশের মাটিতে বিদেশি সেনার যুদ্ধ করার বিরুদ্ধে যে আইন রয়েছে, তার আওতা থেকে বেরনোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

ফিলিপাইনস কংগ্রেসের এক যৌথ অধিবেশনে বুশ তাঁর বস্তাপচা 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নিয়ে ভাষণ দিয়েছেন, তাঁদের ঔদ্ধত্য এতদূর অথবা তাঁরা এতটাই অজ্ঞ যে বুশ তাঁর ভাষণে 'ফিলিপাইনসকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করতে' মার্কিন ও ফিলিপাইন সৈন্যরা কিভাবে একসঙ্গে কাজ করেছিল, তার স্মৃতি রোমন্থন করেন।

বুশ ১৮৯৮ সালের স্পেন-মার্কিন যুদ্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। এই যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইনসকে স্পেনের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। এরপর সে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য মার্কিন শাসকরা বারো বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়ে দশ লক্ষ ফিলিপিনিয়কে হত্যা করে। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর *হুকবালাহাপ* মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে আর একটা যুদ্ধ চালানোর পর অবশেষে ১৯৪৬ সালে ফিলিপাইনসকে স্বাধীনতা দেয়।

এখান থেকে বুশ থাইল্যাণ্ডে গিয়ে সেখানকার সরকারকে এক গুরুত্বপূর্ণ 'ন্যাটো-বহির্ভূত মিত্র' বলে ঘোষণা করেন। এই অদ্ভুত সন্দেহজনক 'সম্মান' আর পেয়েছে ফিলিপাইনস। থাই সরকার আফগানিস্তান ও ইরাকে ইঞ্জিনিয়ার পাঠানোয় বুশ তাদের প্রশংসা করেন এবং সামরিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন। এর ফলে, সাম্প্রতিক কালে থাই সরকার কূটনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে যে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে চলছিল, তার থেকে সরে আসার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং ফলত সে দেশের মানুষের সামনে বিপদসঙ্কেত বেজে ওঠে। মার্কিন সামরিক শক্তির কাছাকাছি থাইল্যাণ্ডের আসার মানেই হল লাওস, ভিয়েতনাম, মায়ানমার, কাম্বোডিয়া ও চীনের বিপদ বৃদ্ধি পাওয়া ও এই অঞ্চলের পারস্পরিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হওয়া।

থাই সেনাধ্যক্ষ জেনারেল চাইসিত শিনাওয়াত্রা যেখানে নতুন বন্দোবস্তের পক্ষে ওকালতি করেছেন, বিশ্বায়নবিরোধী সংগঠন 'ক্যাম্পেন ফর পপুলার ডেমোক্র্যাসির' নেতা সুরিয়াসাই কাটাসিলা বলেছেন, এই ঘোষণার

ছয়ের পাতায় দেখুন

৭ নভেম্বর বাগদাদে মার্কিনবিরোধী বিশাল বিক্ষোভ

ইরাকে মার্কিন সেনা যথেচ্ছ হত্যা করছে

ইরাক দখল করার পর মার্কিন সেনারা সেখানে নিছক সন্দেহ হলেই সাধারণ ইরাকি মানুষদের হত্যা করছে। নিহতদের পরিবারের মানুষজনের শুধু অভিযোগ দায়ের করা ছাড়া আর কিছু করার উপায় নেই। কারণ, কোন ইরাকি নাগরিককে বেআইনিভাবে হত্যার অভিযোগে একজন মার্কিন সেনারও বিচার বা শাস্তি হয়নি; এমনকি মার্কিন সৈন্যের হাতে কতজন ইরাকি সাধারণ মানুষ নিহত বা আহত হয়েছে তার তালিকা দিতেও অস্বীকার করেছে সেনা কমাণ্ডাররা। তারা শুধু জানিয়েছে, নিহত ও আহতদের পরিবার থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি জমা পড়েছে ১০ হাজার ৪০২টি। কটা দাবি সেনা কর্তৃপক্ষ মেনেছে, তার কোনও হিসাব তারা দেয়নি।

মার্কিন সেনাদের দ্বারা হত্যার কোন বিচার ইরাকের কোন আদালতে করা যাবে না। কারণ, দখলদার মার্কিন কর্তৃপক্ষ হুকুম জারি করেছে যে, কোন মার্কিন সৈন্য তো বটেই, বাইরের কোন দেশের কোন সৈন্য বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের বিচার ইরাকি আদালত করতে পারবে না।

হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ সংস্থা, তাদের অনুসন্ধান শেষে বলেছে মার্কিন সৈন্যরা ইরাকে যা খুশি করে রেহাই পাওয়ার অধিকার নিয়ে কাজ করছে। বেসামরিক ইরাকি নাগরিকদের হত্যার মধ্যে সেনাদের আচরণে একটা বিশেষ ধরন দেখা যাচ্ছে, তারা ভয়ঙ্কর আক্রমণাত্মক। জনবসতি এলাকাগুলিতেও গুলিবর্ষণ করছে নির্বিচারে এবং বিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহারে তারা দ্বিধা করছে না। বহু মৃত্যুর কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা নেই, তবুও সেসব নিয়ে ঠিক সময়ে ও পূর্ণাঙ্গরূপে তদন্ত করা হচ্ছে না। ফলে, মার্কিন সেনাদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে, তারা খুশিমতো গুলি চালাতে পারে, সেজন্য তাদের কোন জবাব দিতে হবে না।"

(ব্রিটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকা থেকে হিন্দুস্তান টাইমস্-এ ২৭-১১-০৩ উদ্ধৃত)

ইরাকি প্রতিরোধ গভীর ও বিস্তৃত হচ্ছে

পাঁচের পাতার পর

মধ্যে দিয়ে থাইল্যাণ্ডের সামরিক ক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের নাক গলানোর সুযোগ করে দেওয়ার সম্ভাবনাই বাড়ল (ব্যাঙ্কক পোস্ট, ২১ অক্টোবর)।

বুশ থাইল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন, এশিয়ান প্যাসিফিক ইকনমিক কনফারেন্সে যোগ দিতে। কিন্তু সেই অর্থনৈতিক সম্মেলনের কর্মসূচিকে ঠেলে সরিয়ে তিনি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব এবং উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচিকে বন্ধ করতে বুশের উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য ঐ দেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে আর একটি প্রস্তাব নেওয়ার দাবি করেন।

ইরাকি প্রতিরোধ গভীর ও বিস্তৃত হচ্ছে

কিন্তু এতসব প্রস্তাব ও আক্রমণাত্মক ভাষণ সত্ত্বেও ইরাকি প্রতিরোধের সামনে পড়ে বুশ সে দেশের ওপর দখলদারি বজায় রাখার কাজে যথেষ্ট বাধার সামনে পড়েছেন। পুড়ে যাওয়া মার্কিন ট্রাকের ওপর ইরাকি যুবকের ছবি থেকেই বোঝা যাচ্ছে পেন্টাগন কী সমস্যায় পড়েছে।

২০ অক্টোবর নিউ ইয়র্ক টাইমস্ লিখেছিল, 'ফালুজায় স্বাগতম' লেখা একটা স্তম্ভের গায়ে পথের পাশে রাখা একটা বোমা হেলফায়ার ক্ষেপণাস্ত্রবাহী একটা ট্রাকের ওপর ফাটে এবং তারপর এক বিরাট জনতা গ্যাসোলিন দিয়ে ট্রাকটাকে পুরোপুরি পুড়িয়ে দেয়। মার্কিন সৈন্যরা ট্রাকটির ধ্বংসাবশেষ সরাতে গেলে তাদের ওপর আক্রমণ হয় এবং তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। একই দিনে উত্তর ইরাকের কিরকুক-এ দু'জন মার্কিন সৈন্য মারা যায়। তারপরের দিন ফালুজায় একজন সৈন্য মারা যায় ও ছ'জন আহত হয়। টাইমসের সামরিক সংবাদদাতা মাইকেল গর্ডনের হাতে আসে একটি নথি। এটি অকুপেশন অথরিটির প্রধান তৃতীয় পল ব্রেমার-এর উদ্দেশ্যে তৈরি এবং এতে সাম্প্রতিক সামরিক পরিস্থিতির একটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই নথিতে উল্লেখিত সাম্প্রতিক ঘটনার মধ্যে রয়েছে সি-১৩০ ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ সরবরাহযানের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হানা, দিয়ালা প্রদেশের গভর্ণররের মোটরবাহিনীর ওপর আক্রমণ, মাহমুদিয়ার উত্তরে একটি কনভয়ের ওপর আক্রমণ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যথা তিকরিত, ফালুলার, আল ফাতার ও সাফওয়ানের কাছে, দক্ষিণে বারসয় এবং এই ধরনের নানা জায়গায় অজস্র আক্রমণের সংবাদ, এতে বলা হয়েছে, বাগদাদে ও তার চারপাশে ১১টি বিপজ্জনক অঞ্চল আছে যেখানে 'বিশেষ জরুরি কাজ' ছাড়া মার্কিন সৈন্যের যাওয়ার কথা নয়। (নিউ ইয়র্ক টাইমস, ১৯ অক্টোবর)

এই সমস্ত আক্রমণ সংখ্যায় বাড়ছে, নিখুঁত ও সুসংবদ্ধ হচ্ছে, মুন্সিয়ানাও বাড়ছে; ক্রমশ বেশি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। দখলদারির বিরুদ্ধে ঘৃণা যে ছড়াচ্ছে এবং সক্রিয় প্রতিরোধ যে গড়ে উঠছে — তার সমস্ত চিহ্ন সুস্পষ্ট। মার্কিন বাহিনী যত তাদের অত্যাচার বাড়াচ্ছে ততই তা ইন্ধন জোগাচ্ছে এই ঘৃণায় ও প্রতিরোধে।

ফালুজায় ১৯ অক্টোবর যখন একজন মার্কিন প্যারাসুট সৈন্য মারা যায় ও ছ'জন আহত হয়, তখন মার্কিন সেনারা এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ে লেবাননে পাঠানোর সামগ্রী বহনকারী এক ট্রাকের সিরীয় চালককে হত্যা করে। ঐ ঘটনায় মার্কিনিরা যে দু'জন অসামরিক ব্যক্তিকে খুন করে, এই ট্রাকচালক তাদেরই একজন। এদের মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদের একজন, ইরাকি নাজেম বাজির মাথার পিছন দিকে গুলির ক্ষত ছিল এবং তার হাত দুটো সামনের দিকে রেখে এমন এক দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল, যা দিয়ে মার্কিন সৈন্যরা সন্দেহজনক ব্যক্তিদের বেঁধে রাখে (এ পি, ২০ অক্টোবর)। মৃত ব্যক্তির ভাই সংবাদ সংস্থাটিকে জানায় যে মার্কিন সৈন্যরা 'বাড়ি চড়াও হয়ে, তাকে প্রথমে পায়ে গুলি করে, তার হাত বেঁধে দেয় এবং তারপর তার মাথায় গুলি করে।'

এইগুলি হল মার্কিন শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে যে রীতিনীতি নিয়ম কাজ করে চলেছে তার নিদর্শন। শাস্তি ত' দূরের কথা, অসামরিক নাগরিকদের হত্যার অভিযোগে কদাচিৎ কোন সেনার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়। উপরের ঘটনাটি পরিস্কার খুন। এর মধ্য দিয়ে এমন এক নৃশংস সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, যা ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিনীদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। মার্কিনীদের এই চেহারা আজ একদিকে ইরাকিদের ক্রুদ্ধ করে তুলছে ও মার্কিন সেনাদের মনোবলকে তলানিতে ঠেলে দিচ্ছে।

এই অবস্থায় মার্কিন দখলদারি ক্রমশই বেশি করে প্রতিরোধের সামনে পড়বে; মার্কিন সেনারা আরও বেশি দিনের জন্য আটকে যাবে, বাহিনীর বহর যা আছে তাকে বাড়ানোর দিকে ঠেলে দেবে, নিদেন পক্ষে এখনকার অবস্থায় রেখে দেবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই ঔপনিবেশিক দখলদারির চাপে আরও টলমলে হয়ে উঠবে। আরও সৈন্য ও অর্থের জন্য সে মরিয়া হয়ে পড়বে।

রাষ্ট্রসংঘে ভোট ঃ মার্কিনশাসকরা অর্থের বিনিময়ে জয় কিনল

রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সাম্প্রতিক সমস্ত কায়দা-কসরতের পিছনকার কথা হল এটাই যে, মার্কিনিরা টাকা দিয়ে ভোট কিনল। রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা নিয়ে লড়াই হল আদতে রাশিয়ান পুঁজিপতিদের সঙ্গে জোট বেঁধে ফরাসি ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের লড়াই। এদের লক্ষ্য হল রাষ্ট্রসংঘের ওপর পেন্টাগন ও মার্কিন এজেন্সি ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের বজ্র আঁটুনিকে ভাঙা, কেননা, ঐ দুই সংস্থা হ্যালিবার্টন, বেক্‌টেল, ওয়ার্ল্ডকম ইত্যাদি মার্কিন বহুজাতিক সংস্থাকে সমস্ত বরাত প্রায় দান-খয়রাত করে পাইয়ে দিচ্ছে।

ইরাকে মার্কিনিদের নিদারুণ পরিস্থিতির জন্য বাধ্য হয়েই বুশ প্রশাসনকে রাষ্ট্রসংঘে যেতে হয়েছে। যদিও তারা এর আগে রাষ্ট্রসংঘকে তিরস্কার করেছিল। শেষপর্যন্ত তারা একটা সর্বসম্মত প্রস্তাবও পাশ করাতে পেরেছে। এর ফলে অন্যান্য দেশের পক্ষে সৈন্য ও অর্থ পাঠানোর রাস্তা হয়ত কিছুটা পরিস্কার হবে। কিন্তু প্রস্তাবে যা লিখিত আছে, তাতে শুধুমাত্র মার্কিন দখলদারি ওপর রাষ্ট্রসংঘের একটা মোড়ক লাগানো হবে, এতে কাউকেই কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি। স্বভাবতই এমন একটা প্রস্তাব ১৫-০ ভোটে পাশ হয়ে যাওয়ায় অনেকেরই চোখ কপালে উঠেছিল।

কিন্তু নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর ২০ অক্টোবরের সংখ্যায় মূল প্রবন্ধে এই ভোটের আসল চেহারা ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে 'প্রশাসন ও ঋণদান বিভাগের কর্তাব্যক্তিদের বক্তব্য হচ্ছে সম্ভাব্য দাতাদের চাপের ফলে বুশ প্রশাসন এক নতুন এজেন্সিকে ভার দেবে —কোটি কোটি ডলার ইরাকে কীভাবে খরচ করা হবে, তা স্থির করার জন্য। এই এজেন্সি যাতে মার্কিন দখলদারির আওতার বাইরে থাকে, তার জন্য একে চালাবে বিশ্বব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রসংঘ।'

বিশ্বব্যাঙ্কের এক অফিসারের কথাকে উদ্ধৃত করে দি টাইমস্ বলেছে "ইউরোপিয় দেশগুলি চায় না তাদের দেওয়া অর্থ সিপিএ (কোয়ালিশন প্রভিশনাল অথরিটি) পরিচালিত তহবিলের সঙ্গে মিশে যাক। তাদের অর্থ কীভাবে খরচ করা হবে, তা তারাই ঠিক করতে চায় . . ." নতুন এজেন্সি কন্ট্রাক্ট পদ্ধতি চালু করতে পারে এবং "বিশ্বের বিভিন্ন বহুজাতিকদের কন্ট্রাক্ট দিতে পারে। দাতারা ইরাককে সরাসরিও অর্থ দিতে পারে — শুধু এইটুকু নির্দিষ্ট করে দিয়ে যে তাদের নিজেদের কোম্পানিগুলি কাজটা করবে।"

নিরাপত্তা পরিষদে পাশ হওয়া প্রস্তাব বিশেষ করে বলে দিয়েছিল যে, আমেরিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 'ডেভেলাপমেন্ট ফান্ড' নামে যে সংস্থা ইরাকের জন্য পেন্টাগন তৈরি করেছে, তহবিলের বিলিবন্দোবস্ত করার অধিকার একমাত্র তাদের হাতেই থাকবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, নতুন যে এজেন্সি করার প্রস্তাব নেওয়া হল, তা যদি সত্যই তৈরি করা হয়, তবে তা অন্য সাম্রাজ্যবাদীদের কাছেও বিলিবন্দোবস্তের প্রক্রিয়াটা খুলে দেবে এবং অন্যরাও তাদের আর্থিক স্বার্থ চরিতার্থ করার অভিসন্ধি পূরণ করার জন্য অন্তত ইরাকের মাটিতে পা ফেলতে পারবে। অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিশ্চয়ই এ ধরনের একটা লেনদেনের বিনিময়েই আমেরিকা ১৫-০ ভোটে প্রস্তাব পাশ করাতে পেরেছে।

যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনকে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে, ইরাকের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রসংঘ বা বিশ্বব্যাঙ্কের প্রবেশ আন্দোলনের কোন বিজয় সূচিত করে না। এরা যদি সত্যিই প্রবেশ করে, তার দ্বারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের উপর চাপ কিছুটা কমানো হবে এবং নতুন একদল কর্পোরেট ডাকাতের মুখে ঠেলে দেওয়া হবে ইরাকি জনগণকে।

যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের কাজ হবে সবরকম চেষ্টা করা যাতে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেই ইরাকের ঘাড়ের ওপর থেকে নামানো যায়, সমস্ত বিদেশি সৈন্য সে দেশ থেকে দূর হয়, যুদ্ধের জন্য সংগৃহীত অর্থ মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার হয় এবং ইরাকিদের নিজেদের ভবিষ্যৎ তারা যাতে নিজেরা নির্ধারণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেওয়া।

(সূত্র ঃ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, অক্টোবর ৩০, ২০০৩)

বাগদাদে বুশের নিশীথ যাত্রা

বিশ্বের পয়লা নম্বর দস্যু সর্দার মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ গত ২৭ নভেম্বর চোরের মতো রাতের অন্ধকারে হঠাৎ বাগদাদে মার্কিন সেনাদের তাঁবুতে হাজির হয়েছিলেন। ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল — দেশের জন্য মার্কিন সেনাদের আত্মত্যাগকে অভিনন্দন জানানো। আসল উদ্দেশ্য ছিল — ইরাকি মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্বার প্রতিরোধের সামনে তলানিতে পৌঁছানো মার্কিন সেনাদের মনোবল কিছুটা চাঙ্গা করতে মিথ্যা আশার মকরধ্বজ দেওয়া।

প্রেসিডেন্ট বুশের এই ইরাক দর্শনের পরিকল্পনা মুষ্টিমেয় অনুগত ছাড়া কাউকে জানতে দেওয়া হয়নি। সাংবাদিকদের মুখ বন্ধ রাখারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্টের পরিবারও জানত না। শুধু তাই নয়, প্রেসিডেন্টের গতিবিধি গোপন রাখতে মিথ্যাপ্রচার করা হয়েছিল যে, তিনি এদিন পরিবারের সঙ্গে খানাপিনা করবেন নিজস্ব খামারে। কিন্তু বাস্তবে সেখানে না গিয়ে কাছের একটি বিমানবন্দর থেকে রাতেই রওনা দেন বাগদাদের দিকে। প্রেসিডেন্ট বুশের বিমানে ওঠা যাতে অন্যরা দেখতে না পায়, সেজন্য বিশেষ বিমানটিতে আলো জ্বালানো হয়নি, এবং পিছনের দরজা দিয়ে বিমানে উঠেছিলেন প্রেসিডেন্ট। এই নিশীথ যাত্রায় মাত্র কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও পাঁচজন সাংবাদিক তাঁর সাথী হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট বাগদাদে দু ঘণ্টা ও আকাশে ২৭ ঘণ্টা কাটিয়ে দেশে ফেরার পর তার যাত্রার সংবাদ প্রকাশ করা হয়।

বিশ্বের সকল আধুনিক মারণাস্ত্রের যারা অধিকারী, বিশ্বজোড়া ছড়ানো যাদের গোয়েন্দা জাল, তাদের এত গোপনীয়তা কেন? আসলে দস্যু সর্দারের প্রাণে ভয় ছিল প্রবল। মাত্র কিছুদিন আগে তার প্রতিরক্ষা সহসচিব উলফউইটজ্ ও সদ্য ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্র বাগদাদে গিয়ে ইরাকি মুক্তিযোদ্ধাদের ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রের যে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন এবং তারপর উলফউইটজ্ যেরকম কাঁপতে কাঁপতে সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট তা ভুলে যাননি।

ইরাকের মাটিতে মার্কিন সেনারা যখন জানবে, তাদের দেশের প্রেসিডেন্ট এমনই বীর যে, কাউকে না জানিয়ে রাতের অন্ধকারে চোরের মতো বাগদাদে গিয়েছিলেন, তাতে ঐ সেনাদের মনোবল বাড়বে না কমবে, বলা মুশকিল!

বীরভূমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাগরিক সভা

রামপুরহাট

৯ নভেম্বর রামপুরহাটে আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে এক নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের দাবিতে ও দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত নাগরিক সভায় মূল বক্তব্য রাখেন গুণাধীশ দাস। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কিরণ কুমার, বিভাস রায় চৌধুরী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফোরামের পক্ষ থেকে রতন মুখার্জী। বক্তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জঙ্গি শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সভা থেকে কিরণ কুমারকে সভাপতি এবং গুণাধীশ দাসকে সম্পাদক করে ২০ জনের অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের একটি শাখা কমিটি গঠিত হয়।

সিউড়ি

১১ নভেম্বর সিউড়িতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কিশোরী রঞ্জন দাস। এই নাগরিক সভায় মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন কাঞ্চন সরকার। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কার্তিক হাজরা, শান্তি কুমার মুখার্জী, দোলগোবিন্দ ব্যানার্জী, শিবপ্রসন্ন গুপ্ত প্রমুখ। এছাড়া অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত। কিশোরীরঞ্জন দাসকে সভাপতি ও কাঞ্চন সরকারকে সম্পাদক করে ১৩ জনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফোরামের সিউড়ি শাখা কমিটি গঠিত হয়।

ফ্যাসিস্ট কর্পোরেট নীতির বিশ্বায়ন

তিনের পাতার পর

ব্রিটেনের অসওয়াল্ড মোসলে বলেছেন ঃ "আমাদের নীতি হল একটা কর্পোরেট রাষ্ট্র গঠন করা। ... (এই রাষ্ট্রে) শ্রেণীসংগ্রামের বদলে প্রতিষ্ঠিত হবে জাতীয় ঐক্য ও সহযোগিতা। যারা জাতীয় নীতি বিরোধী ও শ্রেণী বিদ্বেষের স্বার্থে কাজ করতে চাইবে, তাদের রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় কঠোরভাবে দমন করা হবে।"

কর্পোরেট রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি কী ? মুসোলিনি বললেন ঃ "রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি ব্যক্তি সম্পত্তি রক্ষা করবে। কর্পোরেট রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি হল, 'ব্যক্তিগত উদ্যোগ'কে উৎসাহিত করা। আমরা আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন। কেননা আমাদের 'বিপ্লব' হল বিগত এক শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফল।" বস্তুতই তাই। শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে, পুঁজিবাদী সংকটের তীব্রতা লক্ষ করে মুসোলিনির কর্পোরেট রাষ্ট্র ও কর্পোরেট অর্থনীতি হল শ্রমিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে আর এক বিপ্লবের — অর্থাৎ প্রতিক্রিয়ার বিপ্লব বা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের প্রতিবিপ্লবেরই সুচিন্তিত পরিকল্পনার রূপায়ণ। যার সোজাসাপ্টা মানে হল, "পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরোধী বামপন্থী দলগুলি যে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে তার মোকাবিলা করা।" 'দি স্পিরিট অ্যাণ্ড স্ট্রাকচার অফ ফ্যাসিজম' নামের পুস্তকে ব্রাডি এভাবেই বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করেছেন।

এমন এক পরিস্থিতিতে আক্রান্ত শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলনের শূন্যস্থান পূরণ করে "সালিশি মীমাংসা।" শুধু রাষ্ট্রনায়করাই নয়, দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বে এবং তথাকথিত বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলন ও সরকারগুলিও আজ সে পথেই এদেশে চলেছে। এটাই এখন প্রধান রাষ্ট্রীয় প্রবণতা। ধর্মঘট নিষিদ্ধ হলে সংগঠন গড়ার অধিকারও নস্যাৎ হয়। কারণ ধর্মঘট কেউ একা করে না। গোটা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে মেরে দিয়ে "সালিশি মীমাংসার" একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার কাজকে সহজ করতেই আসছে নতুন শ্রম বিরোধ আইন, যেখানে গরিষ্ঠ অংশের শ্রমিক-কর্মচারীর সদস্যভিত্তিক ইউনিয়নকেই স্বীকার করে নিয়ে কর্তৃপক্ষ আলোচনায় বসবে। অন্যান্য ইউনিয়ন গুরুত্বহীন হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, গোপন ব্যালটের ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতির ভিত্তিতেই ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর সেই ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হবে কাজ বা উৎপাদন বজায় রেখেই। মালিকদের প্রতি অনুগত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ধারা এইভাবেই ভারতবর্ষেও কর্পোরেট গণতন্ত্র বা ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার ভিতকে শক্তিশালী করবে। মালিকদের যথেচ্ছ শ্রেণীশোষণ চলবে 'জাতীয় স্বার্থে'র নামেই। যার মোদ্দা কথা হল মালিকী শাসন-শোষণ থাকবে — থাকবে না প্রতিরোধ। বিরুদ্ধতা করলে হবে কঠোরভাবে পীড়ন। যেমন হল তামিলনাড়ুতে, কেরালায়, যেমন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। শাসকরা দেশজুড়ে ব্যক্তিগত বেসরকারি উদ্যোগের জয়ধবনি তুলে কর্পোরেট অর্থনীতি ও কর্পোরেট গণতন্ত্রকে সংহত করে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার পথেই সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে চলেছে। বিজেপি সরকারের শিল্পনীতি, শিক্ষানীতি সহ সর্বক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের এক সর্বাঙ্গীন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আজ নগ্নরূপে প্রকাশিত। আর তাই মানসিক জগতে ফ্যাসিবাদের ভিতকে পাকাপোক্ত করতে শোষিতশ্রেণীকে অন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে অধ্যাত্মবাদী-সামন্তী কুসংস্কারের চিন্তায় আচ্ছন্ন করে, হিন্দুত্ববাদী উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িক ও নানা উপজাতীয় দ্বন্দ্বকে প্ররোচিত করে, শোষিত মানুষের ঐক্যকে ধবংস করে, শ্রেণী- সমন্বয়, শ্রেণী ঐক্য ও উগ্র জাতীয় স্বার্থের ও যুদ্ধের উন্মাদনায়, দেশপ্রেমের মায়াজালে ফাঁসিয়ে দিয়ে। পাশাপাশি অর্থনীতির ব্যাপক সামরিকীকরণের দ্বারাও অর্থনীতির কৃত্রিম তেজীভাব সৃষ্টি করতে চায়, যা আজ পৃথিবীর সব পুঁজিবাদী দেশেই ঘটছে।

চরম এই বিপদের মুহূর্তে শ্রমিক বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করতে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম ও আন্দোলনকে তীব্রতর করাই একমাত্র জরুরি ঐতিহাসিক কর্তব্য। বর্তমান সংকট থেকে পুঁজিবাদের আত্মরক্ষার প্রক্রিয়া হিসাবে কর্পোরেট নীতিকে হাতিয়ার করে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করার বাস্তবতা যেমন নগ্ন হয়ে উঠছে, তেমনিই শ্রমিকশ্রেণী ও মালিকশ্রেণীর অনিরসনীয় দ্বন্দ্বকে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুক্তিসঙ্গত পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, প্রিয় নেতা কমরেড নীহার মুখার্জী, সরকারি আর্থিক নীতি ও রাজনৈতিক পদক্ষেপগুলিকে নিছক কতগুলি অর্থনৈতিক আক্রমণ হিসাবে দেখাননি। বরং গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্যমণ্ডিত বক্তব্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি '০৩-এর বাজেট প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "অর্থমন্ত্রী তাঁর দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি পূরণের উপায় হিসাবে নগ্ন জনবিরোধী ও পুঁজিপতিতোষণের ফর্মূলা পেশ করে চূড়ান্ত ভণ্ডামিকেই প্রকাশ করেছেন। ... এ ধরনের 'ফ্যাসিবাদী' অর্থনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমরা জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।" এই আক্রমণকে 'ফ্যাসিবাদী' আক্রমণ হিসাবে চিহ্নিত করে আমাদের দলের নেতৃত্ব অন্যান্য সমস্ত তথাকথিত বামপন্থীদের থেকে নিজেদের ঐতিহাসিক বিপ্লবী স্বাতন্ত্র্যকে তুলে ধরেছে।

সামগ্রিকভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলগুলি এই ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে গেলেও, লক্ষ্যণীয় যে, রাজ্যে রাজ্যে দমনপীড়ন, নানারকম নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও চাষী-মজুর, শিক্ষক-অধ্যাপক, ছাত্র-যুব, নারী সকলের মধ্যেই আন্দোলনের আকাঙ্খা বাড়ছে। আন্দোলনের তরঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকার রাজপথ প্লাবিত হয়েছে, কিন্তু কেবল এর দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসবে না। ইতিহাসের অনেক বড় বড় বিপর্যয় — প্রতিবিপ্লব, ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থানের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে মহান স্ট্যালিন বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর সামনে তুলে ধরেছেন এক অমূল্য শিক্ষা ঃ

"বিপ্লব কখনও কোনদিন আপনাআপনি আসেনা। এর জন্য প্রস্তুতি দরকার। এটাকে জয় করতে হয়। আর সত্যিকারের বিপ্লবী পার্টিই বিপ্লবের জমি তৈরি করতে পারে, বিপ্লবের সাফল্য অর্জন করতে পারে। ইতিহাসে এমন মুহূর্ত দেখা যায় যখন বিপ্লবী পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, বুর্জোয়াদের শাসনের গোড়া পর্যন্ত নড়ে উঠেছে, তা সত্ত্বেও বিপ্লব সফল হল না। কেননা বিপ্লবের সাফল্যকে চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে দিয়ে বুর্জোয়াদের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা, যথেষ্ট শক্তি ও প্রভাব নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত দল তখনও অনুপস্থিত।"

ফ্যাসিবাদের আক্রমণ ও আন্দোলনের উত্তাল সমুদ্রের তটভূমিতে দাঁড়িয়ে এই শিক্ষাকে মূল্য দিয়ে বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সংগ্রামে আমাদের প্রতিটি নেতা ও কর্মীকে এবং সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সময় এটাই দাবি করে।

(সমাপ্ত)

কমরেড মধু সিন্‌হার জীবনাবসান

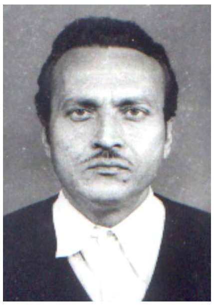

গত ২৭ নভেম্বর, বেলা ১১টায় এস ইউ সি আই বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য, বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড মধু সিন্‌হা (৬৫) মোটর সাইকেলে যাওয়ার পথে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। একটি গাড়ির সাথে সংঘর্ষে মোটর সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে তিনি অচৈতন্য হয়ে যান। তাঁর জ্ঞান আর ফিরে আসেনি এবং বেলা ২-১০ মিনিটে তিনি ইস্পাত হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াত কমরেড মধু সিন্‌হার দুর্ঘটনা ও মৃত্যুসংবাদ অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং হাসপাতালে দলের কর্মী-সমর্থক ও দরদী মানুষের ভীড় বাড়তে থাকে।

প্রয়াত কমরেড মধু সিন্‌হা দুর্গাপুর ইস্পাতে চাকরির শুরুর দিন থেকেই ছিলেন বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের শরিক। এইচ এস ই ইউ (সিটু)'র সাথে যুক্ত থাকাকালীনই যৌথ আন্দোলনের ময়দানে তিনি এস ইউ সি আই কর্মীদের সংস্পর্শে আসেন এবং সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, শ্রমিক আন্দোলনকে অর্থনীতিবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে সঠিক দিশায় সমাজবিপ্লবের পরিপূরক করে যদি গড়ে তুলতে হয়, তাহলে সিটুর মধ্যে থেকে তা সম্ভব নয়। তাই ঐ সংগঠনের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে সমমনোভাবাপন্নদের সাথে সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে গড়ে তোলেন সংগ্রামী ইস্পাত সংগঠন ডি এস ডব্লু সি সি। উদ্যোগী ও সংগ্রামী চরিত্রের জন্যই তিনি সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে তিনি হন সাধারণ সম্পাদক। আমৃত্যু সাধারণ সম্পাদক থেকে স্টিল প্ল্যান্টের কোক ওভেন, রিফ্র্যাক্টরিস সহ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি দাওয়া নিয়ে ছোট-বড় অসংখ্য প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, বারবার কর্তৃপক্ষকে পিছু হটতে ও সংযত হতে বাধ্য করেছেন। ১৯৮৭ সালে ত্রাণের নামে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কাছ থেকে স্বেচ্ছাচারী কায়দায় অর্থ কেটে নিয়েছিল, তা ফেরত দিতে বাধ্য করেছিলেন। সিটু'র সাথে হাত মিলিয়েও কর্তৃপক্ষ ঘৃণ্য ক্লাস্টার প্রথা পর পর কয়েক বছর চালু করতে পারেনি শুধুমাত্র কমরেড সিন্‌হার নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলনের চাপে। শ্রমিকরা দলমত নির্বিশেষে তাঁর কাছে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসতেন। কারণ তাঁরা জানতেন, এই শ্রমিক নেতা ছিলেন দলীয় সঙ্কীর্ণতামুক্ত। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য, উন্নত রসবোধ ও স্নেহপ্রবণ মনের জন্য তিনি বহু শ্রমিক পরিবারের মা-বোনেদেরও সুখ-দুঃখের সাথী ও নির্ভরযোগ্য অভিভাবকে পরিণত হয়েছিলেন।

দুর্গাপুর ইস্পাতের বাইরে বিভিন্ন সংস্থার শ্রমিকদের সংগ্রামেও তিনি নানা সময়ে নানাভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। একই সাথে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী নিজের বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলার সংগ্রামটিও তিনি চালিয়ে গেছেন, যার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি দলের বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য হন। শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার জন্যই তিনি ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি, রাজ্য কমিটি ও সর্বভারতীয় কাউন্সিলের সদস্য হন এবং ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান স্টিল ওয়ার্কার্স'-এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

কর্তৃপক্ষের শ্রমিকস্বার্থবিরোধী অন্যায় আচরণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে অনমনীয় লড়াইয়ের সেনাপতি শ্রমিকদরদী প্রয়াত কমরেডের মরদেহ নিয়ে যাত্রা পথে 'সেপকো'র সদস্যরা তাঁদের অফিসের সামনে জমায়েত হন, সজলনেত্রে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। শেষ যাত্রার পথে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কর্মক্ষেত্র ডি এস ডব্লু সি সি অফিসে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসতেই আশ-পাশের শ্রমিক পরিবারের মা-বোনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সি পি আই, এ আই টি ইউ সি সহ বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি, এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র জেলা সম্পাদক কমরেড এ এল গুপ্তা। এরপর তাঁর মরদেহ কয়েক শত মানুষ এস ইউ সি আই জেলা অফিসে নিয়ে আসেন। সেখানে অসংখ্য মানুষ অপেক্ষায় ছিলেন শেষবারের মত তাঁদের প্রিয় মানুষটিকে দেখার জন্য। সেখানে সি পি আই (এম), সি পি আই, আর এস পি, বি এস পি প্রভৃতি রাজনৈতিক দল ও এ আই টি ইউ সি, ইউ টি ইউ সি-এর নেতৃবৃন্দ মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড অনিল সেন, রাজ্যসম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা ও দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ উপস্থিত না থাকতে পারায়, তাঁদের পক্ষ থেকে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বাদশা খান ও এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল কুণ্ডু মাল্যদান করেন। জেলা কমিটির অন্যান্য সদস্যরা, ইউ টি ইউ সি-এল এস'র অনুমোদিত বিভিন্ন ইউনিয়ন-এর নেতৃবৃন্দ, দলের বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটির নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করেন। শত শত মানুষের মৌন সুশৃঙ্খল মিছিল এগোতে থাকে ভিড়িঙ্গি মোড়ের দিকে। সেখান থেকে মরদেহবাহী গাড়ি শ্মশানের দিকে যাত্রা করলে পুরো মিছিল কান্নায় ভেঙে পড়ে। মৌনতা ভেঙে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে "কমরেড মধু সিন্‌হা লাল সেলাম" ধবনিতে তাঁরা বিদায় জানান প্রয়াত নেতা ও সহকর্মীকে।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

খবর এক নজরে

ভারতে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে

সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) এক সমীক্ষা রিপোর্ট জানিয়েছে, বিশ্বের যে ১৭টি দেশে অপুষ্ট ও ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বেশি সে দেশগুলির অন্যতম হচ্ছে ভারতবর্ষ। বাকি ১৬টি দেশের অন্যতম হচ্ছে পাকিস্থান, সুদান, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রমুখ।

উক্ত রিপোর্ট আরও জানিয়েছে যে, ১৯৯০-৯২ এবং ১৯৯৬-৯৭ সালের মধ্যে ভারতে ক্ষুধার্ত ও অপুষ্ট মানুষের সংখ্যা ২ কোটি হ্রাস পেলেও পরবর্তী চার বছরে ভারতে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা নতুন করে ১ কোটি ৯০ লক্ষ বেড়েছে।

সাড়ে ছয় কোটি মানুষের মাথার ওপর ছাদ নেই

এ দেশে সাড়ে ছয় কোটি মানুষ মুক্ত আকাশের নীচে থাকতে বাধ্য হয়। খুবই শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যে তারা জীবন নির্বাহ করে। শুধুমাত্র রাজধানী দিল্লী শহরেই ১,০০,০০০ মানুষের কোনো স্থায়ী আস্তানা নেই।

(সংবাদসূত্র ঃ হিন্দুস্থান টাইমস্, ২৬ নভেম্বর, ২০০৩)

বন্ধ কারখানার ৩৬ লাখ মানুষ অনাহারে

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ২৭৪টি বড় কারখানা বন্ধ। বন্ধ ছোট, মাঝারি, রাষ্ট্রায়ত্ত কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সংস্থার সংখ্যা ৫৬ হাজার। এর ফলে প্রায় ৮ লাখ ৬৭ হাজার শ্রমিক-কর্ম-চারী কর্মহীন। এদের পরিবার পিছু ৪ জন করে সদস্য ধরা হলে এখন রাজ্যে ৩৬ লাখ মানুষ কার্যত অনাহারে।

(প্রতিদিন-এ কমল ভট্টাচার্যের নিবন্ধে উদ্ধৃত ২৭-১১-০৩)

নতুন মার্কিন অস্ত্র পরীক্ষা

২৪ নভেম্বর শুরু হওয়া সপ্তাহের মাঝামাঝি পেন্টাগন তাদের বিশাল অস্ত্রভাণ্ডারে নতুন সংযোজিত অস্ত্র ১১ টন ওজনের স্যাটেলাইট গাইডেড ম্যাসিভ অর্ডন্যান্স এয়ার ব্লাস্ট বম্ব, যার পোষাকী নাম হচ্ছে "মাদার অফ অল বম্বস"-এর পরীক্ষা ঘটালো ফিলাডেলফিয়াতে। বিস্ফোরণের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হিসাবে ৩১০০ কিমি বিস্তৃত অঞ্চল পুরু কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। ৬৪ কিমি দূরবর্তী অঞ্চল থেকে এ দৃশ্য দেখা গেছে।

(সংবাদসূত্র ঃ সাপ্তাহিক টাইম, ১ ডিসেম্বর ২০০৩)

তিন বছরে বাজেট বহির্ভূত খরচে দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে

১৯৯৯ থেকে ২০০২ সাল, এই তিন আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাজেট বরাদ্দের বাইরেও অতিরিক্ত ২৩ হাজার ৪০৮ কোটি টাকা খরচ করেছে। কিন্তু সংবিধানের ২০৫(১) (খ) ধারা মোতাবেক রাজ্য বিধানসভায় তার হিসাব পেশ করে ওই অতিরিক্ত খরচ বা 'এক্সেস গ্রাণ্ট' রেগুলারাইজ করেনি। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সি এ জি'র রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের যে ২৪টি রাজ্য এরকম হিসাব পেশ করেনি, তাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে শীর্ষস্থানে।

পশ্চিমবঙ্গের পরেই রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, খরচের পরিমাণ ২৩,২৮৪ কোটি টাকা। তবে উত্তরপ্রদেশ ওই বাড়তি খরচ করেছে ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে। মহারাষ্ট্র ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০০২ সালের মধ্যে বাড়তি ১০ হাজার ৩৮৫ কোটি টাকা বাড়তি খরচ করেছে যার কোনও হিসাব রাজ্য বিধানসভায় দেয়নি। বিহার ১৯৭৭-৭৮ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে ৬৯৬৪ কোটি এবং অসম ১৯৮৩-৮৪ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে ২৩২০৬ কোটি টাকা বাড়তি খরচ করেছে যার কোনও হিসাব বিধানসভায় দেয়নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেকর্ড পরিমান ২৩৪০৮ কোটি টাকা বাড়তি খরচ করে রাজ্য বিধানসভায় তার কোনও হিসাব দেয়নি।

(সূত্র ঃ বর্তমান, ২৭ নভেম্বর, ২০০৩)

কোচবিহারে এম এস এসের অবস্থান

মহিলা পুলিশ দিয়েই মহিলাদের গ্রেপ্তার করতে হবে এবং সন্ধ্যার পর মহিলাদের গ্রেপ্তার করা যাবে না — এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বাতিল করে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে তার প্রতিবাদে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কোচবিহার জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১০ নভেম্বর কোচবিহার শহরে কাছারির মোড়ে এক অবস্থানের কর্মসূচি পালন করা হয়।

সভায় মূলপ্রস্তাব পাঠ করেন যুথিকা নাথ। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ফিরোজা আহমেদ ও সুজাতা সেন। এম এস এসের সভানেত্রী বনানী ঘোষ বলেন, পশ্চিমবাংলা তথা সারা ভারতবর্ষে নারী ধর্ষণের বহু ঘটনার সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীরা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকছে। ফুলবাগানের নেহারবানুর ঘটনা, পুলিশ ভ্যানে বধির মেয়ের ধর্ষণ, সম্প্রতি খোদ দিল্লীতে রাষ্ট্রপতির রক্ষীবাহিনীর হাতে কলেজ ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনা, পুলিশ লকআপে নারী ধর্ষণ — এসব মর্মান্তিক ঘটনার পরও যদি সুপ্রিম কোর্ট মহিলাদের গ্রেপ্তারের ক্ষমতা পুরুষ পুলিশের হাতে তুলে দেয়, এমনকি সূর্যাস্তের পরও, তাহলে মহিলাদের নিরাপত্তা বলে কিছু থাকবে না। নাজমা খন্দকার বলেন, সর্বোচ্চ বিচারালয় এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলো নারীর সম্ভ্রমের উপর আক্রমণের আইনি ক্ষমতা পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছে, যাতে মহিলা আন্দোলনকারীরা নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। জেলা সম্পাদিকা রীণা ঘোষ এই রায় বাতিলের দাবিতে সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

১০ হাজার আর এস এস সমর্থককে 'গোয়া মুক্তিসংগ্রামী' বানিয়ে দেওয়া হয়েছে

ওরা কোনদিন জেলে যায়নি, গ্রেপ্তার হয়নি, এমনকি গোয়ার মুক্তি আন্দোলনের সাথে ওদের কোনও যোগই ছিল না। এদের অধিকাংশ গোয়ার সীমান্ত কোথায়, সেটাও জানেন না। তবুও এরা 'গোয়া মুক্তি সংগ্রামী'র আখ্যা পেয়ে সরকারি পেনশনের সুবিধা পেতে চলেছেন। এবং এদের সংখ্যা ১০ হাজার। এদের সবচেয়ে বড় সার্টিফিকেট হচ্ছে এরা আর এস এস-এর সমর্থক। শুধু এজন্যই মহারাষ্ট্রের ৪০০০ ও কর্ণাটকসহ অন্যান্য রাজ্য থেকে বাকি ৬০০০ জন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে 'স্বতন্ত্র সৈনিক সম্মান পেনশন' পেতে চলেছেন, অর্থাৎ এদের তা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে এই অনুমোদন পেয়ে যাওয়ার কথা। কেন্দ্রীয় সরকারে ও গোয়া সরকারে বিজেপি থাকার সুযোগ এভাবেই কাজে লাগাচ্ছে আর এস এস।

কিন্তু এই ঘটনা প্রকৃত সংগ্রামীদের প্রবল ক্ষুব্ধ করেছে। তাঁদের মতে, এর দ্বারা ইতিহাসের মারাত্মক বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে।

সরকারি হিসাবে গোয়া মুক্তি সংগ্রামীর সংখ্যা মাত্র ১২০০। অনেকেই মারা গিয়েছেন। সরকারি আচার-আচরণ দেখে অনেকে নাম নথিভুক্ত করতে চাননি।

শ্রীপ্রভাকর সিনারি একজন গোয়া মুক্তি সংগ্রামী। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন, তদানীন্তন পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে জেলে দিয়েছিল। জেলে তিন বছর ধরে তাঁর উপর শারীরিক নিপীড়নও চালানো হয়েছিল। ১৯৬১ সালে গোয়া স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ সংগ্রামের সাথে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকারের বহু উচ্চপদে তিনি চাকরি করে এসেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, আর এস এস সমর্থকদের এভাবে মুক্তি সংগ্রামী বানিয়ে দেওয়ার পিছনে মতলব হচ্ছে, প্রকৃত সংগ্রামীদের পুরোপুরি ভুলিয়ে দেওয়া। এবং এমন ধারণা তৈরি করা যেন গোয়াকে মুক্ত করার সংগ্রামের প্রথম সারিতে সংঘ পরিবার ছিল।

শ্রীসিনারির মতে, পর্তুগীজ দখল থেকে দাদরা ও নগর হাভেলি মুক্ত করার লড়াইয়ে বড়জোর ৪৫ জন আর এস এস-এর লোক ছিল এবং তারা বলেই দিয়েছিল যে, তারা ব্যক্তিগতভাবে থাকছে, আর এস এস-এর পক্ষ থেকে নয়। অথচ, ২০০১ সালে ১০ ডিসেম্বর উপপ্রধানমন্ত্রী এল কে আদবানি ও পেট্রলিয়াম মন্ত্রী রাম নায়েক গোয়ায় গিয়ে, সরকারি নিয়মবিধি লঙ্ঘন করে ১১৫ জন আর এস এস কর্মীকে ঐ লড়াইয়ে তাদের 'ভূমিকা'র জন্য সম্মান পেনশন দিয়ে আসেন। গোয়ার প্রকৃত মুক্তি সংগ্রামীদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। এখন আয়োজন চলছে ১০ হাজার আর এস এস সমর্থকদের মাসে ৪ হাজার টাকা করে পেনশন পাইয়ে দেওয়ার।

এই হচ্ছে আর এস এস-এর সততা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের নমুনা!

(সংবাদসূত্র ঃ ডেকান হেরাল্ড, ৭-১১-০৩)

স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে নাগরিক কনভেনশন

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে ২৩ নভেম্বর কলকাতার আই এম এ হলে মেডিক্যাল শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মী, রোগী এবং সংবাদমাধ্যমের গণতান্ত্রিক অধিকার বিষয়ে একটি নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক অম্লান দত্ত, অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা, বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অমিয় চ্যাটার্জী প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও আই এম এ-র সহ-সভাপতি ডাঃ সুভাষ চক্রবর্তী। উপরোক্ত বিষয়ে সভা থেকে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, মেডিক্যাল শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অধিকার ক্রমাগত খর্ব হচ্ছে। যথার্থ মেডিক্যাল শিক্ষা ভবিষ্যতে জনস্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ। অথচ দেখা যাচ্ছে, সরকার জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে এবং ক্রমেই স্বাস্থ্য পরিষেবাকে একটি লাভজনক পণ্যে পরিণত করে বিনিয়োগকারীদের কাছে একটি আকর্ষণীয় ব্যবসা হিসাবে তুলে ধরছে। স্বাস্থ্য ও মেডিক্যাল শিক্ষার পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও বিকাশের জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে মেডিক্যাল শিক্ষা ও সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যুগোপযোগী হতে ব্যর্থ হচ্ছে। এমনকি পূর্বের কাঠামোটুকুও ধরে রাখতে পারছে না।

আজ যখন প্রচারমাধ্যমগুলি একের পর এক মেডিক্যাল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিকাঠামোগত দৈন্যদশা তুলে ধরছে এবং ছাত্র, স্বাস্থ্যকর্মী ও জনসাধারণ এই বেহাল অবস্থার বিরুদ্ধে বারবার ক্ষোভে ফেটে পড়ছে তখন সরকার স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নের পরিবর্তে প্রতিবাদকারীদের উপর প্রতিহিংসামূলক আচরণ করছে।

ডাঃ বিজ্ঞান বেরা বলেন, গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। ফলে গ্রাম থেকে আসা রোগীদের চাপ কলকাতার হাসপাতালগুলিতে বাড়ছে।

কনভেনশন থেকে অন্যান্য দাবির সাথে আর জি করের ঘটনায় নিরপরাধ জুনিয়ার ডাক্তারদের ওপর থেকে সাসপেনশন অবিলম্বে তুলে নেওয়ার দাবি জানানো হয়। উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে হাইকোর্টের অন্তবর্তীকালীন নির্দেশে সাসপেণ্ড হওয়া ডাক্তাররা পুনরায় কাজে যোগ দেওয়ার পর রাজ্য সরকারও তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তির নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। কারণ, সরকার কোনও অভিযোগই দেখাতে পারেনি।

এস ইউ সি আই প্রকাশিত নতুন বই

১। নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা ও ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলন — *শিবদাস ঘোষ*

২। **Communism – Historical destiny of civilization** — *Nihar Mukherjee*

৩। স্ট্যালিন স্মরণে — *নীহার মুখার্জী*

৪। **Remembering Stalin** — *Nihar Mukherjee*

৫। ইরাকের জনগণের লড়াই আমাদের সকলের লড়াই

প্রতিটি বইয়ের দাম পাঁচ টাকা

৬। সি পি আই(এম) কী প্রশ্নে এস ইউ সি আই-এর সাথে ঐক্য ভেঙেছিল।

দাম তিন টাকা

প্রাপ্তিস্থান

এস ইউ সি আই অফিস

৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ১৩

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩০ ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net